# দুষ্টু টুসটুসি

গিরিধারী কুন্ডু

# দুষ্টু টুসটুসি

গিরিধারী কুণ্ডু

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া ১৩৮২
৫ নভেম্বর ১৯৭৫

চতুর্থ সংস্করণ :
আষাঢ় ১৩৯৪
জুন ১৯৮৭

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩



প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : আট টাকা

টিংকু রীতা রজত তিতি তিস্তা দোলা ম দেবু
অঞ্জু জয় সুমোহন রাহুল পুপলু বাপ্পা মুন্নু
শ্যামল অনুপ মিঠু
মিসেল ফেবিয়েন
ওদের বয়সী সব ছোটদের

## এই বইতে আছে

# দুষ্টু মিষ্টি
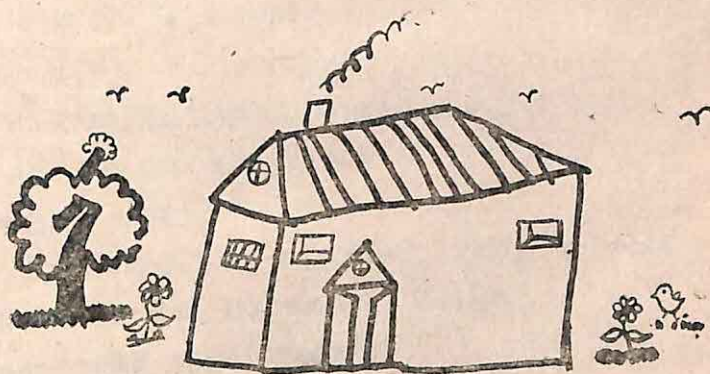
এ ছবিটি এঁকেছে সাত বছরের সুমোহন চট্টোপাধ্যায়

## খুশির কারণ

সবে মাত্র বাড়ি এসেছি। বাপী কোত্থেকে যেন ভোঁ-দৌড়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে বললে,

—দাদা, একটু আগে না দুধের মত ধবধবে একটা পায়রা ধরলুম রে। উড়তে পারে না। ছাদে এসে বসেছিল। ধরে ফেললুম। কি মজা!

মা ঘরেই ছিল। খুশিতে জ্বলজ্বল করতে থাকা ওর চোখের দিকে চেয়ে মা বললে,

—কে বলল, উড়তে পারে না? সন্ধ্যে হলে অনেক পাখিই চোখে দেখতে পায় না। তোর পায়রাটাও দেখেনি হয়ত। তাই উড়ে এসে বসেছিল। দেখবি, কাল সকালে ছুট দেবে।

মাকে ভেংচি কাটলে বাপী।

—ধ্যুৎ, আজেবাজে কথা বলবে না তো। উড়তে পারে না ছাই! আচ্ছা দাদা, কি খেতে দেব রে?

বললুম শুধু,

—আবার একটাকে জোটালি? গম-টম দে গে।

খুব নরম গলায় এবার ও বললে,

—দাদা, চল দেখবি।

সারাদিনের কাজ সেরে সবে বাড়ি ফিরেছি, গা-হাত পায়ে তখনও এক ফোঁটা জল ঢালা হয়নি, তাই ভাল না লাগায় বললুম,

—কাল সকালেই দেখব। যা বোকা।

বোকা বলে ফেলায় রাগ করল বোধহয়। ভেংচিয়ে চলে গেল।

শীতের রাত। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। কোথাও টু শব্দ পর্যন্ত নেই। গা ছমছম অন্ধকারে থমথম করছে বাড়ির সব দিক। দুচোখে ঘুম না থাকায় গল্পের বইয়ের ভিতর তলিয়ে যাচ্ছিলুম। বাপীর ফিসফিসে গলা কানে এল,

—এই দাদা, দরজা খোল। খাঁচাটা নেব। কাল সকালে খাঁচায় পুরতে হবে। নয়ত বেড়াল-টেড়াল ঝগড়া করতে আসবে।

দরজা খুলে দিতে খাটের নিচ থেকে নোংরা খাঁচা বার করে নিলে। নাক কুঁচকে বললে শুধু,

—ইস্, খাঁচার কি অবস্থা! মা দেখছি পরিষ্কার করেও রাখেনি।

চলে গেল বাথরুমের দিকে। এ ভীষণ ঠাণ্ডায় বেচারা জল ঘাঁটতে বসল, খাঁচা পরিষ্কারের জন্যে। বয়স তেরো পেরলে কি হবে, জীবজন্তুর প্রতি ওর এখনও অনেক টান।

সেবার একটা টিয়াপাখি ছাদের কার্নিশে এসে বসল। স্নান সারতে ছাদে উঠেছিল, যেই না টিয়া রং চোখে পড়া, কলের মুখ থেকে মাথা সরিয়ে চুপিচুপি এগিয়ে এসে হাতের গামছা ছুঁড়ে দিয়ে ধরে ফেলল বাপী। কান্নাকাটি করে মা-দিদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিনে আনলে তারের খাঁচা।

টিয়াটা দিব্যি ছিল কিন্তু। সময় পেলেই কত যে যত্ন করে। তবে ওকেও সারা দুপুর থাকতে হয় ইস্কুলে, মার কাঁধে তাই চাপল দেখাশুনার সব কিছু। ব্যস্, দিনকে দিন পাখিটা মাকেও মায়ায় জড়াল। ও না থাকলে, মা-ই স্নান-টান করিয়ে দেয়।

একটা ব্যাপারে বাপী অসুবিধেয় পড়লে! সবাই ঠাট্টা করে বলে,

—কি রে, তোর ছেলে আর কবে কথা বলবে?

মা টিয়াকে রসিকতা করে নাম দিয়েছিল—বাপীর ছেলে।

একদিন ছেড়ে দিলে ওকে। উড়ে গিয়ে টিয়াটা বসল কার্নিশে। ছুটি পাওয়ায় ডাক ডেকে উঠল বারবার। তারপর নীল
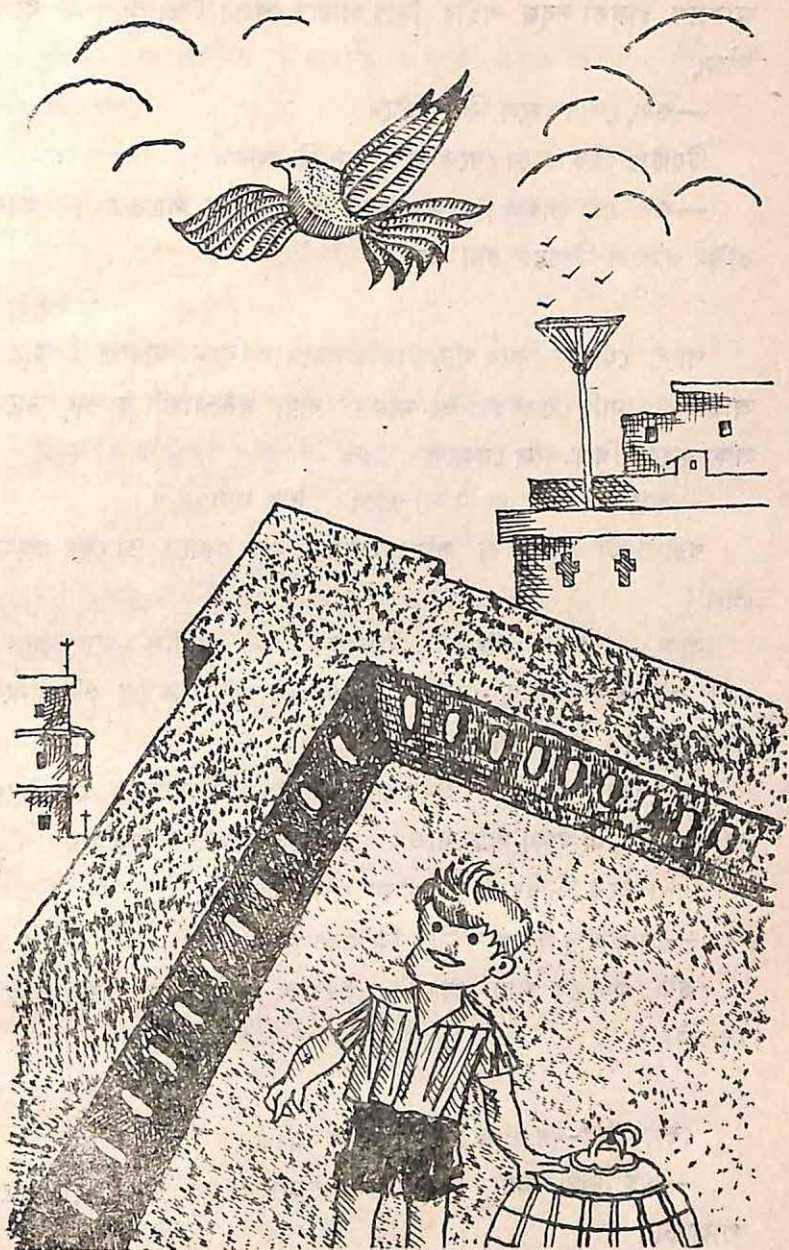
একটু দূরে কাল রাতে পরিষ্কার করে রাখা খাঁচাটা পড়ে।

আকাশে হালকা সবুজ শরীর নিয়ে হারিয়ে গেল! তা দেখে মা বলে উঠলে,

—ওমা, তোর ছেলে কি পাজীরে!

টিয়াটার ডাক কানে যেতে বাপীর সে কি আনন্দ!

—ওই তো ডাকল! কে বলেছে কথা বলতে পারে না? আর কদ্দিন থাকলে নিশ্চয়ই কথা বলত।

পয়সা যোগাড় করে পাঁচ টাকায় খরগোস কিনে আনলে একবার। আবার নাচানাচি শুরু হল ওর মনে। বাবা খরগোসটাকে ভাল ভাবে লক্ষ্য করতে গিয়ে বলে ফেললে.

—আরে, এর যে একটা পা ভাঙা! দাঁড় করা দেখি।

খরগোসটা যে সত্যি সত্যি খোঁড়া, দাঁড় করাতে তা বেশ বোঝা গেল।

বাবা বকাবকি করল। মারলও। মন খারাপ হয়ে গেল। রাগ কমাতে ও দেশবন্ধু পার্কে, গিয়ে এক ভিখিরীর কোলে ওটা বসিয়ে দিয়ে মেজাজে বলে গেল—

এটা রইল, বুঝলে? অযত্ন যেন না হয়। মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। আর এ টাকা দুটো নাও। খাওয়াবে-দাওয়াবে ঠিক মত।

বিপদ বুঝে ভিখিরীটা তো করুণ গলায় বললে,

—খোকাবাবু খরগোস নিয়ে কি করব?

কার কথা কে আর শোনে! ততক্ষণে বাপী মাথার ভার কমিয়ে দে-দৌড়!

ভোরে হাত-মুখ ধুচ্ছি। বাপী ডাক ছাড়ল।

—এই দাদা, দেখে যা। কেমন সুন্দর ছাদের ওপর বসে আছে পায়রাটা।

মনে মনে বললুম,

—বাঃ বেশ দেখতে তো!

অন্যমনস্কতা কাটিয়ে কাছাকাছি এগুতে অবাক হলাম। বললুম চমক ধরা গলায়,

—তোর পায়রা কোথায় গেল রে?

ভেজা গলায় ও বলে উঠলে,

—উড়ে গেল রে! ওই ছাখ না কাবুলদের বাড়ির ছাদে গিয়ে বসেছে।

একটু দূরে কাল রাতে পরিষ্কার করে রাখা খাঁচাটা পড়ে!

মন মরা বাপীর মুখের ওপর চোখ ছিল, হঠাৎ ও বলে ফেললে,

তাতে কি হয়েছে? ও তো উড়তে পেরেছে!

# টুপুর রাগ

দাদার সঙ্গে আড়ি। আড়ি-আড়ি-আড়ি। আর কখনো ভাব করব না তো বলছি। রাগ না করে উপায় ছিল আমার ?

ও না ভীষণ দুষ্টু। এক নম্বরের পাজী। বাবু একবার বাড়ি ফিরে আসুক, ওকে আচ্ছাসে পিটুনি দিতে বলব। বাবুর কাছে বলব—বাবু দ্যাখো, দাদাভাই একটা সুন্দর প্রজাপতিকে ধরতে না পেরে মেরেছে। বাবু দাদাকে বকবে। খুব মারবে। সুন্দর একটা প্রজাপতিকে মারার জন্যে দুষ্টুটা শাস্তি পাবে।

একটুতে ভীষণ রাগ হয় দাদার। প্রজাপতিটাকে ধরতে পারছিল না বলে রেগেমেগে শেষ পর্যন্ত ব্যাডমিণ্টন খেলার ব্যাট তুলে এমন মারল না—ওর একটা পাতলা পাখনা ভেঙ্গে মুখ গুটিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে! আর কিছুতে উঠে উড়তে পারল না।

দিনকে দিন বেয়াদব হয়ে উঠছে দাদা। নইলে কেউ কখনো অমন রং-বাহারী প্রজাপতিকে মেরে ফেলতে চায় ? অবশ্য সত্যিসত্যি প্রজাপতিটা মরে যায়নি। তবে, মরে যাবার অবস্থা হয়েছে, আর কি ?

এই কিছুক্ষণ আগে, ঘরের ঠিক জানালার নিচে রোদের ওপর পিঠ রেখে বসেছিল প্রজাপতিটা। ওর গায়ের রং কি সুন্দর! ডানায় জড়িয়ে কালোর ভেতর কত সব রং। একেবারে ধারের দিকে লালচে ফুটকি ফুটকি, আরো অনেক আঁকাজোকাও ছিল। পাতলা ফিনফিনে পাখাদুটো ভেঙে রং গড়িয়ে পড়ছিলো ঝকঝকে রোদের মধ্যে। টুপুর ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল।

পড়ার বই এদিক-সেদিক ফেলে রেখে যেই চুপিচুপি ওকে ধরতে গেছি—আঙুল এগিয়ে একটু ছুঁয়েছি কি ছুঁইনি, অমনি ডানা দুটোর

কি ছটফটানি ! ওড়া শুরু করে দিল প্রজাপতিটা। খুব উঁচুতে উড়ে গিয়ে দেয়ালের সবচেয়ে ওপরকার তাকে বসল একটু। চারদিক দেখতে লাগল চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

অত উঁচুতে টুপু, মানে আমার হাত যাবে না দেখে দাদাকে কাছে আসতে বললাম।

—এই দাদাভাই, প্রজাপতিটা ধরে দে-না। কি সুন্দর! তাই না-রে ?

দাদাভাই সেণ্টু, ছোট্ট একটু উত্তর দিল অমনি—হুঁ।

আর তারপর-ই ব্যাডমিণ্টনের ব্যাট ( আমাদের তো একটা ব্যাট আছে ) আনতাবড়ি ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক উড়িয়ে দিতে লাগল প্রজাপতিটাকে। প্রজাপতিটা আবার উঠল···উড়ে গিয়ে বাইরের দোলনার ওপর বসল।

দোলনায় বসেছে দেখে দোলনাটা আস্তে একটুখানি ঠেলে দিলাম। সেটা তখন-ই সামনে-পিছনে দুলতে শুরু করল। প্রজাপতিটা চুপটি করে বসে থেকে দোল খেয়ে নিল মজাসে।

হাততালি দিয়ে যেই আবার ওকে ধরতে গেছি—ও খুউব উঁচুতে উড়ে গেল। ঘুরপাক খেতে থাকল ওপর নিচে। ভয় পেয়েছিল বোধহয়। ঘরের ভেতর থেকে দাদাভাই ভোঁ-দৌড়ে বেরিয়ে এল। র‍্যাকেট হাতে নিয়ে আবার এদিক-ওদিক অস্থিরভাবে ঘোরাতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। ভীষণ ভয় করল আমার, কি জানি দাদা আবার কি করে বসে! চেঁচিয়ে ওকে বললাম,

—দাঁড়া দাদাভাই, আমি রুমালটা বলের মত গোল করে ছুঁড়ে দিচ্ছি ওর গায়। দেখবি আপসে প্রজাপতিটা আবার নিচে নেমে আসবে।

ও আমার কোন কথা শুনল না। মুখ ভেংচিয়ে বলে উঠল,

—ধ্যুৎ, তুই চুপ কর। তুই কি জানিস ? ও সহজে নিচে নেমে আসবে না। আমি অনেক প্রজাপতি দেখেছি, ওরা ভীষণ দুষ্টু।

বলতে বলতে ও আমাকে ঠেলে দিয়ে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ঠিক পাগল হয়ে ব্যাট ঘোরাতে থাকল তাড়াহুড়োতে। সাঁই করে ব্যাটের একটা হঠাৎ ঝাপটা এসে লাগল প্রজাপতিটার গায়ে। আর না তখন-ই ঝুপ্ শব্দে পড়ে গেল ও! আমার তাতে এত কষ্ট হচ্ছিল—। এখনও পর্যন্ত এত কষ্ট হচ্ছে—মুখ খুলে সে-কষ্টের কথা নিজেকে ছাড়া আর কাকে-ই বা বুঝিয়ে বলব? বাড়িতে তখন বাবু নেই, মা মণি কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে।

দাদাভাইকে রাগ রাগ গলায় বলে দিলাম আমিও।

—দাদা, তুই প্রজাপতিটা মেরে ফেললি? তুই যদি না ওড়াতে পারতিস বলতে পারতিস যে—বোন, আমি ওড়াতে পারব না! ওড়াতে পারছি না—। তাহলে আমাকে বলতিস আমি ওড়াতাম। আমি না হয় উড়িয়ে একটু পরে ধরে তোকে দিতাম। তুই হাত দিয়ে ধরতে যদি ভয় পেতিস, আমি তাহলে বাকসের মধ্যে ভরে রাখতাম। রোজ ওকে নিয়ে খেলা করতাম। তুইও খেলা করতিস ওকে নিয়ে।

এবার তোমরা-ই বল, ওর সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে ঠিক করিনি?

একথা বলে-ই টুপু মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে ছটফট করতে থাকা প্রজাপতিটাকে দেখতে লাগল মনোযোগ দিয়ে। আর মনে মনে দুঃখ পেল খুব। দাদার ওপর টুপুর এতো রাগ ধরছে যে—এখন-ই ওর মাথায় ব্যাডমিণ্টনের ব্যাটটা দিয়ে একটা বাড়ি লাগিয়ে দেয়—ঠিক যেমন করে দাদা প্রজাপতিটাকে মেরেছিল!

# হাত চোর

—কি ব্যাপার ঝরি, আবার কি হল ?

—স্যার, যাট নম্বর লাশের বাঁ হাত পাওয়া যাচ্ছে না! জরুর কেউ চোট করে দিয়েছে চুপে চুপে।

ডকটর মল্লিকের ভয়-চোখ লাফিয়ে উঠল তিড়িং করে। জ্বলজ্বলে চাউনিতে রীতিমত প্রশ্ন।

—অঁ্যা! এ কি বলছ ঝরি!

একটু থেমে বকুনি দেবার জন্যে, রাগ রাগ গলায় বললে,

—বাজে কথা বল না ঝরি! চোর নেবার কিছু পেল না। শেষপর্যন্ত চুরি করতে এল মরা মানুষের হাত ? এ নিশ্চয়-ই তোমার বা লছমনের কাজ!

কৃত্রিম রাগ রাগ গলায় বললে ঝরি,

—সাব কসম খেয়ে বলছি, এ কাজ আমি করিনি। বিশ সাল ধরে এ হাসপাতালের মর্গে কাজ করছি। লাশ কাটার রিপোর্ট তৈয়ার না হতেই হাত সরিয়ে ফেলব আমি! বিশ্বাস করুন হুজুর আমি নিইনি। হাঁ লছমনকে বলিয়ে। ও বেটা জরুর কোন ছেলের কাছে হাড় বিক্রির জন্যে হাত চোট করেছে।

লছমনকে একথা জানাতে ও আবার দোষ চাপিয়ে দিল ঝরির-ই ওপর।

শরীরের সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর তবেই মরার কারণসহ রিপোর্ট লিখতে হয় ডকটর মল্লিককে। এখন যাট নম্বর মড়ার হাত না পেলে রিপোর্ট যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এমনও হতে পারে, মরার কারণ ছিল ওই হাতে-ই।

ভয় দেখাবার জন্য মল্লিক সাহেব বলল,

—ঝরি, কাল সকালের ভেতর ষাঠ নম্বর লাশের বাঁ-হাত না দেখতে পেলে, এ চাকরিতে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব কিন্তু!

হায় রাম! ডকটর সাব এ কি কথা বললে। কাল সকালের ভেতর হাত না যোগাড় হলে, চাকরি—।

ভয়ে কোন কথা বার হল না ঝরির। যেমন তেমন নিয়ে এলেও ঝামেলা মিটবে না। কারণ চৌকস বুদ্ধি এই মল্লিক সাবের। হাঁ— একেবারে ষাট নম্বর লাশের হাত হতে হবে!

কোন উপায় না পেয়ে লছমনকে বুঝিয়ে বলল ঝরি,

—হ্যাখ, আমাদের মুলুক এক জায়গায়। তুই যদি হাড় বিক্রি করার জন্যে হাত লুকিয়ে রাখিস, তবে দিয়ে দে ভাই। মল্লিক সাব বলেছে হাত না মিললে চাকরি চলে যাবে আমার। চাকরি গেলে এ বাজারে না খেয়ে মরব, বল? কসম খেয়ে বলছি, আমি তোকে পেট ভরিয়ে মিষ্টি খিলাব। এবার দিয়ে দে।

জানাল লছমন।

—আরে, না নিলেও বলব আমি নিয়েছি! আচ্ছা, কবে থেকে গাপ হয়েছে?

—এক হপ্তা হল কারেন্ট নেই। লাশগুলো কি অবস্থায় আছে তা দেখে আসতে ডকটর সাব পরশু বলল। একেবারে গলে-পচে যাচ্ছে দেখে ঠাণ্ডা ঘরের দরজা খোলা ছিল। আজ গিয়ে দেখি যাট নম্বর লাশের কাঁধের জয়েন্ট খোলা! বাঁ-হাত নেই কোথাও।

সকাল হলে ঝরির চাকরি যে শেষ, তা ও ভেবে নিয়েছে মনে মনে-ই।

মর্গের বারান্দায় অন্যদিনের মত খাটিয়া পেতে চোখ বুজে শুয়ে, তবু চোখে এতটুকু ঘুম নেই ওর। সাজানো টিন হুড়মুড় করে হঠাৎ পড়ার শব্দ কানে যেতে উঠে দাঁড়াল। কে আবার টিনের কৌটো-মৌটো

নিয়ে রাত দুপুরে নাড়াচাড়া করছে লাশ কাটার ঘরে? ভেতর ভাল-ভাবে দেখে নিয়ে-ই তো তালা ঝুলিয়েছে দরজায়। তবে কে ফেলল? যত রাজ্যির কৌটো নিয়ে এসে ঘর নোংরা রাখে এই লছমন। না—কাল সকাল হলে এগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রকাণ্ড এক লাঠি পড়ে খাটিয়ার কাছে। কোনো কোনো দিন কুকুর তাড়াতে এটার বেশ প্রয়োজন হয়। এখন এই লাঠি হাতে নিয়ে লাশ কাটার ঘরে না ঢুকে উপায় কি!

হনহনিয়ে লাশ কাটার ঘরে চলে গেল ঝরি। যেই আলো জ্বেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছে এমন সময় কানে এল একটা টিন গড়িয়ে যাবার শব্দ! এ শব্দ তো পাশের মড়া রাখার আলমারির কাছ থেকে-ই এল?

ও-ঘরে গিয়ে টিমটিমে আলো জ্বেলে ছানাবড়া চোখে দেখে নিল চারধার। সত্যি, গ্যালারির কাছটায় জবড়জঙ্গ করে রাখা টিনগুলো মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে বেশ! উরে ব্বাস্, এত্ত বড় বড় ইঁদুর এল কোত্থেকে? আবার লাইন দিয়ে চলেছে! ঝরি যে ঘরে, তা এদের খেয়াল-ই নেই! আবার একটা প্রকাণ্ড ইঁদুরের লেজে জড়ানো ছোট্ট পুচকি এক ইঁদুর! হারিয়ে যাতে না যায় তাই বোধহয় লেজে জড়িয়ে নিয়েছে এর অভিভাবক।

পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল ঝরি। দপদপ করে জ্বলছে ওর রাগ ভরা চোখ। আরে, এ যে সাংঘাতিক কাণ্ড!

গ্যালারির নিচ থেকে আধ-খাওয়া একটা হাত টেনে বার করছে কষ্টেসৃষ্টে। এনে-ই কুট কুট শব্দে মজাসে পচা-গলা মাংস গিলছে ঝরির দিকে পিঠ ফিরিয়ে। ওই পুচকেটা তবে—রে! তোমরা চুঁয়ার দল আরামসে মাংস খাচ্ছ, আর এদিকে আমার চাকরি যায় যায়! রাগে আগুন জ্বলে উঠল ঝরির মাথার ভেতরটায়।

হাতের সেই লাঠি উঠিয়ে এইসা জোরে মারল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে লাফ মেরে চিঁ-চিঁ করে ডাকতে ডাকতে দে ছুট সব! পালাতে

পারেনি শুধু একটা-ই! সে হল ওই পুচকি। ওর রক্তে মাথা থেঁতলানো শরীর পড়ে মেঝেতে।

আসলে গরমে পচে-গলে যাওয়ায় বাঁ-হাত, কাঁধের জয়েন্ট, মানে জোড়া থেকে বেশ আলগা হয়ে গেছল, সেই সুযোগে বাছাধন ইঁদুরেরা কাঁধের চারপাশ কুচি দাঁত দিয়ে কেটে ফেলেছে। তারপরে-ই না লুকিয়ে রেখেছিল, রোজ একটু একটু করে খাবার জন্যে।

মরা পুচকি ইঁদুর কাছে রেখে বাকি রাত জেগে জেগে কাটিয়ে দিল ঝরি। বলা তো যায় না, আবার এই ইঁদুরের লাশ কে বেপাত্তা করে দেয়।

পরের দিন নিজের টেবিলে যথারীতি কাজ নিয়ে ব্যস্ত ডকটর মল্লিক। ঝরি পড়ি কি মরি হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাঁফ সামলে বললে,

—সাব, চোর পাকাড় গিয়া। আভি লে আতা হ্যায়!

বলেই একদৌড়ে লেজে দড়ি বাঁধা মরা পুচকিকে নিয়ে এসে মল্লিক সাহেবের চোখের সামনে তুলে ধরল।

ডকটর মল্লিকের ছানাবড়া চোখ দুটো তিড়িং তিড়িং একটু লাফিয়ে উঠল।

ঝরি-ই বললে,

—হাঁ সাব স্রেফ একটা-ই না। আরো অনেক ছিল। হায় রাম! সব কটা ইয়া মোটা আর এক হাত সমান লম্বা। জয়েন্ট পচে যাওয়ায় দাঁত দিয়ে কেটে গ্যালারির নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। কাল রাতে আমাকে দেখে-ই সব পালিয়েছে। এটার পিঠে লাঠি পড়েছে, তাই পালাতে পারেনি। আপনাকে দেখাবার জন্য যত্ন করে রেখেছি। জী সাব আভি চাকরি চলা যায়েগা?

লাশ —মানুষ বা যে কেউ মরে গেলে ডাক্তাররা তাকে লাশ বলে।
মর্গ—লাশ রাখবার ঠাণ্ডা ঘর।

# রাজা হালুম বাঘ

—হ্যালো, আলিপুর চিড়িয়াখানা? সাদা বাঘকে একটু দিন তো, কথা বলব।

একটু পর-ই বেশ ভারিক্কি গলা শোনা গেল অন্য দিক থেকে,

—আমি সাদা বাঘ কথা বলছি। আপনি কে?

—নমস্কার নেবেন। আমি দাপটপুরের বাঘা রাজা হালুমের মন্ত্রী শ্রীমান শূকর কথা বলছি। আমাদের মহামান্য রাজা কলকাতায় বেড়াতে যাবেন খুব শিগ্‌গির। আপনি তাঁর জন্যে একখানা প্রকাণ্ড বাড়ি ঠিক করে রাখবেন, বুঝলেন?

দাপটপুরের বাঘা রাজা কলকাতায় আসতে চান? কি সাংঘাতিক কথা! তাই,

সাদা বাঘ তাই ভয়ে ভয়ে বলল,

—না না হালুমদাকে কিছুতে-ই পাঠাবেন না। কলকাতায় লোকজনের বড্ড ভিড়, এখন না আসা-ই ভাল।

ভীষণ রাগ হল এ কথা শুনে। ভয় দেখাবার জন্যে গম্ভীরস্বে বলল শূকর,

—ঠিক করে দেবেন-ই নইলে দাপটপুরের রাজা রেগেমেগে কলকাতা ছারখার করে দেবেন বলেছেন। হ্যাঁ—

কলাপাতায় তৈরি টেলিফোন নাবিয়ে রাখল শূকর। গুহায় এসে ঢুকে দেখল, ফরফর করে নাক ডাকতে ডাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে বাঘ। চলে যাচ্ছিল ও। কিন্তু হালুমের পিছু ডাকে ঘুরে দাঁড়াল।

হালুম বলল,

—পাকা কথা হয়ে গেছে তো ?

স্যার—সাদা বাঘ আমতা আমতা করছিল। বলছিল, কলকাতায় এখন খুব ভিড় ; গেলে আপনার অসুবিধা হবে। কষ্ট হবে ভীষণ। তা আমি স্যার ধমক দিয়ে সব ঠিক করে ফেলেছি।

গোঁফ ঝাঁকিয়ে বাঘ বলে উঠল এবার,

—গুড।

আবার প্রচণ্ড গলায় ডেকে ওঠে,

নেংটি—

ছোট্ট এই টুকুন ইঁদুর বাঁশের ঝাঁপ সরিয়ে গুহার ভেতর এল ভয় ভয় পায়ে। হালুমকে বলল,

—আমায় ডাকছিলেন স্যার ?

শক্ত থাবা উঁচিয়ে রাগ রাগ গলায় জিজ্ঞেস করল হালুম,

—কোথায় ছিলে শ্রীমান নেংটী ? তুমি আজকাল তোমার কাজে খুব ফাঁকি দিচ্ছ কিন্তু।

ইয়া লম্বা লেজখানা দুকানে দুবার টকাস টকাস টেকিয়ে নেংটি জানায়,

—আজ্ঞে হালুমদা শরীরটা আমার ম্যাজম্যাজ করছে ক'দিন ধরে। তাই দেরি হয়ে গেল। মাফ করে দিন এখনকার মতন। আর দেরি হবে না।

নেংটির কথা শুনে হালুম বাঘ ভীষণ খুশি। হা—হা করে হেসে উঠল।

—জান নেংটি, এবার পূজোয় আমি কলকাতায় বেড়াতে যাচ্ছি। এ খবরটা সমস্ত কাগজে যাতে ছাপা হয়, তা তুমি বলে দিও।

নাক থেকে পড়পড় চশমাটা এক ঠেলা মেরে নেংটি বলল,

—স্যার, পূজোয় কলকাতায় অনেক ভিড় হয়। সেবার আমার এক মামা ওখানে গিয়ে ফাঁপরে পড়ে গেছল। ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি সব বাড়ি। খোলামেলা আলো বাতাস এতটুকুও নেই। একদিন না—গরমে শ্বাস

আটকে মরে-ই যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে পালিয়ে এসে তবে বেঁচেছে। আপনি যাবেন না মহারাজ। ভীষণ কষ্ট পাবেন। তাছাড়া কত দূর দেশ থেকে অতিথিরা আসে এসময়। ওদের জ্বালায় মাছ মাংস বা ভাল খাবার-দাবার কি আর পাবেন?

যেই না এই বলা, হুংকার ছাড়ে হালুম বাঘ।

—চোপরাও। তুমি খাবারের ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? ঘ্যানঘ্যান করে আমার মুখের ওপর কথা কখ্খনো বলবে না বলছি। আমি বুঝি ভি. আই. পি. নই? কলকাতার চিড়িয়াখানায় আমাদের যে রাষ্ট্রদূত সাদা বাঘ আছে, ওর সঙ্গে শূকর ভাই কথা বলেছে। সে-ই ওখানকার বড় বড় লোকদের ব'লে আমার থাকা খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করবে। যাও, আমার কলকাতা যাবার ব্যাপারটা চারদিকে জানিয়ে দাও। কালকের মধ্যেই দাপটপুরের প্রত্যেকে একথা যাতে জানতে পারে। নইলে—

বাপ্রে বাপ, এ আবার কি কথা বলছেন রাজা হালুম? হালুমের কথার ওপর মাতব্বরি করা চলে! একবার রেগে-মেগে ভুলেও যদি মুখে পুরে দেয় না—!

নেংটি ছুটে পালিয়ে গেল।

এখানকার খবরের কাগজ বলতে তালপাতাকে বোঝায়। এরকম এক তালপাতার ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কলকাতার উদ্দেশ্যে হালুম বাঘের বেড়াতে যাবার কথা বেরিয়েছে। দাপটপুরে এখন এটা-ই জবর খবর। অনেকে এ খবর শুনে ভয়ে বলাবলি করল—

না রাজাকে ওখানে যেতে দেওয়া হবে না। কলকাতার এত ট্রাম-বাস-লরি ছোটাছুটি করে যে, যে কোন সময় রাজা চাপা পড়ে যেতে পারেন। এমনও হতে পারে, হালুম রাজা কলকাতাকে ভালবাসে ওখান থেকে আর ফিরলেন-ই না!

এদিকে কলকাতার মস্ত শিকারী টিংলুবাবু কি এক কাজে দাপটপুরে এসেছিলেন। বিভিন্ন জীবজন্তু নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন। হাটের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ওরকম জটলা দেখে। দেখলেন, বড় বড় বটগাছের ডালে মস্ত এক তালপাতা ঝোলান। ওখানে বনের সব রকম জন্তুরা ভিড় জমিয়ে মনোযোগ দিয়ে কি যে পড়ছে। বন্দুক উঁচিয়ে টিংলুবাবু মার্চ করে এগুতে-ই ওরা সরে গেল এদিকে সেদিকে। বাঁকা বাঁকা সাপ খেলান অক্ষরগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুঝলেন ব্যাপারটা। তখন-ই একটানে তালপাতাটা খুলে নিয়ে সোজা জীপে চেপে কলকাতায় এসে হাজির।

আর কলকাতায় এসে-ই একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড শুরু। এখানে ফোন ক'রে, ওখানে ফোন ক'রে, হালুম যাতে শহরে ঢুকতে না পারে, তার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিলেন। ফলাও ক'রে 'হালুম বাঘ আসছে' এই খবর বেরুল পরের দিন। রীতিমত হৈ হুল্লোড় পড়ে গেল ব্যস্ত এই শহরে। নতুন জুতো, জামা প্যাণ্ট কেনার চিন্তার মাথার ভেতর ডুব দিল। বাঘ আসছে, বাঘ আসছে বলে হুঁশিয়ার বাণী প্রচার হতে থাকল রেডিওতে, মাইকে।

আপনারা কেউ রাস্তায় বেরুবেন না। শহরে বাঘ এসেছে। ভীষণ মারাত্মক এই বাঘের নাম হল রাজা হালুম।

তবু সবাই বলল ভয় শরীর গরম রাখার জন্যে,

—আসুক না বাঘ, চিড়িয়াখানায় তাহলে বাঘের সংখ্যা বাড়বে। ভাল ই হল। এমনিতে তো এখানে বাঘের সংখ্যা কম-ই।

তবে, সন্ধে হলে রাস্তায় পা ফেলতে চাইলেন না কেউ। বড়রা নয়-ই। কি জানি কখন এক লাফ মেরে বাঘ এসে ঘাড়ের ওপর পড়ে।

দুদিন চলে যায় আরো। রাজা বাঘের পাত্তা নেই তবু। আলিপুর থেকে সাদা বাঘ চিন্তিত হয়ে দাপটপুরে ফোনে যোগাযোগ করল। শুনল, হালুম বাঘ কলকাতার দিকে দুদিন আগে-ই বিশেষ ট্রেনে চেপে চ'লে গেছে। তাহলে কি হল! বিপদ আপদ ঘটল কোনো?

চিন্তা হবার কথাই তো! অতবড় এক বাঘ গা ঢাকা দিল কোথায়? দিনেরবেলাতেও শহরে ভয় নেমে এল। লাঠি বন্দুক নিয়ে কলকাতার লোকেরা বেরুতে লাগল এবার। একবার হাতের কাছাকাছি ধরা পড়লে-ই বাঘকে তারা কেটে-কুটে ফেলবে যেন!

সত্যি বলতে কি রাজা বাঘ কলকাতায় এসে পৌঁচেছে যথা সময়ে-ই। রাস্তায় ট্রেন লেট হয়েছিল। তাই অনেক রাতে স্টেশনে এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজা-বাজারের কাছে বাগান আর পাহারাওয়ালা এক বাড়িতে ঢুকে পড়ল সে। দিনেরবেলা বেরুতো না, ভয় করত একটু। কারণ পাহাড়ের মতন উঁচু সব বাস আর মুখ থেবড়া লরির ঘনঘন চেঁচামেচিতে কান দুটোয় তালা লেগে যায়; তাছাড়া রাস্তায় কত যে লোক! এত মানুষ আবার এ তল্লাটে থাকে নাকি? তাহলে ক'টা দিন বেশ রসিয়ে রসিয়ে মানুষের মাংস খাওয়া যাবে!

এমনিতে-ই এখানে আসা অব্দি সে ভীষণ রেগে গেছল। রাষ্ট্রদূত সাদা বাঘ তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে আসে নি। এমন কি ওই পাজী বাঘটার পাত্তা এখনও পর্যন্ত নেই। একবার হালুম দেশে ফিরে যাক না, সাদা বাঘের চাকরী ডিসমিস করে দেবে-ই।

বান্টি, টিংলুবাবুর ভাইপোর নাম। রোজ সকালে ও পড়ার বই পড়া শুরু করার আগে, খবরের কাগজ নেড়েচেড়ে দেখে। বাঘ আসার কথা বান্টি শুনেছে। এবার বিশ্বাস না হয়ে যায়! এই তো প্রথম পাতাতে-ই বিশেষ সংবাদদাতা বলছেন—

মাণিকতলার মোড়ে হলুদ ছোপে ভরা প্রকাণ্ড সেই বাঘকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে কাল সন্ধের দিকে।

বান্টি বেশ একটু মেজাজ নিয়ে বলল,

—এ বাঘটা গোলমাল করে ফেলল তো। আর তিন দিন

বাদে পূজো শুরু হবে। অথচ এ সময়-ই গণ্ডগোল পাকাতে এল দাপটপুরের বাঘ? বেড়াতে যাবার আর কোনো জায়গা খুঁজে পেল না হালুমটা!

একবার দস্যি বাঘকে সামনাসামনি দেখার ইচ্ছে যে হচ্ছিল না, তা নয়। টিংলুবাবুর কাছে এসে মনের কথা বলে ফেলল বান্টি।

—জেঠু তোমার দোনলা বন্দুকটা নিয়ে চল না মাণিকতলায়। মনে হচ্ছে নটি বাঘটা মানিকতলার ধারে কাছে নিশ্চয়-ই রয়েছে। আমরা ওখানে গিয়ে-ই মারধর শুরু করব না। শুধু দেখা করব। সম্ভব হলে আমি কিন্তু ভাবও জমাব।

এরকম কথা শুনে টিংলুবাবু তো অবাক।

—ভাব করবি? বান্টি তুই কি সাংঘাতিক ছেলে রে বাবা! না না তোকে সঙ্গে যেতে হবে না। দরকার হলে থানার বড়বাবুকে নিয়ে আমি যাব' খন।

রাজা হালুমের পেটে কবে থেকে খাবার-দাবার কিছু পড়ে নি। পেটের ভেতরটা চোঁ চোঁ করছে সমানে। সঙ্গে কাউকে না আনার জন্যে নিজেকে সে গালাগালি করল খুব। শ্রীমান নেংটিকে আনতে পারত। ও বেচারীর দোষ নেই। নেংটি তো আসতে-ই চেয়েছিল। হালুম-ই জেদ করে কাউকে আনে নি। ও কাছে থাকলে পেটের ভেতরটা এরকম গড়ের মাঠ হয়ে থাকত না।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকা কোনরকমে-ই সম্ভব হল না। হালুম বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। কিন্তু এ কি কাণ্ড! মানুষের দল সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে দেখছে? ভাবল সে,

—এত সাহস এদের? আমি হলাম গিয়ে বাঘা এক জন্তু। শিকারী পর্যন্ত আমাকে দেখে ভয় পায়, অথচ এরা গিলে খাবার মত করে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে?

হালুম বাঘ রাগে, অভিমানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোঁয়া ফুলিয়ে ডাক ছাড়ল কয়েকবার।

আশ্চর্য! তাতেও ভয় পাচ্ছে না কেউ-ই। যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনিভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে মানুষগুলো!

ওই তো বছর ছয়েকের একটা দুষ্টু ছেলে বন্ধুকধারী এক ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে চুপিচুপি হাসছে। ওর সারা মুখে ঠাট্টা ভেজান হাসি। নিশ্চয়-ই তোমরা চিনতে পারছ, ওই ছোট্ট ছেলেটা, আমাদের বান্টি!

ওখান থেকে বাঘ এক দোকানে ঢুকে পড়ল। দোকানদাররা সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে ভেতরে দৌড়ে পালাল। হালুমের পেটে তখন কি প্রচণ্ড খিদে! সে চোখ পাকিয়ে সমস্ত দোকান দেখে নিল। বড় নীল মত এক কৌটোয় হাতি, খরগোস, নেংটি ইঁদুর, জিরাফ কত সব জীব জন্তুর ছবি! জোরসে থাবা পাকিয়ে ঘুষি মারল হালুম। সঙ্গে সঙ্গে কৌটোর মুখটা ভেঙ্গে চুড়চুড় হয়ে গেল। টিনের কাটা অংশ থাবায় লাগায় ডগডগে রক্ত বেরুতে লাগল কিছুক্ষণ। সেদিকে নজর নেই হালুমের।

আরে, এ যে গুঁড়ো দুধ! মজা করে কৌটোর দুধ চেটে পুটে খেয়ে ফেলল সব। এক সময় গলার ভেতরটা গুঁড়োদুধে আটকে আসতে চাইল যেন। জল তেষ্টা পেল খুব। তাই আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল রাজা বাঘ। এখানেও লোকের মাথা? মাথায় মাথায় রাস্তার দুপাশে ভর্তি!

পুলিশের গাড়ি কেন? বড় বড় লোহার খাঁচা সমেত কয়েকটা গাড়ি রাস্তার ওপর। একটা গাড়ির পা-দানিতে কচি ছাগলছানা বাঁধা না! থানার বড়বাবু ভেবেছিলেন খিদের চোটে বাঘ নিশ্চয়ই ছাগলকে আক্রমণ করতে এগোবে। আর তখন-ই পাকড়াও করে সোজা চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ওদের ফন্দি ধরতে ধুরন্দর হালুমের খুব দেরি হল না। অথচ

হালুম বাঘ রাগে, অভিমানে······ডাক ছাড়ল কয়েকবার।

সমানে বুক ধুকধুক ধুকধুক করছে। আবার লোভও হচ্ছিল একটু একটু। কারণ ছাগলছানাটা বেশ নাদুসনুদুস সে! খিদের সময় ভাল-ই লাগবে।

ক'জন সেপাইকে বন্দুক তাক করে এগিয়ে আসতে দেখে হালুম ভাবল—না আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহলে সে ধরা পড়বে-ই দস্যিদের হাতে। খুব জোরে তাই দৌড়তে শুরু করল। দৌড়তে দৌড়তে লাফিয়ে উঠে পড়ল বুবাইদের দোতলা বাড়ির ছাদে। ছাদ টপকে ওবাড়ি থেকে অন্য এক বাড়ির কার্নিশ ঘেঁষা জানালায় উঁকি মারতে টুটুর পিসিমণির গলা থেকে গান আর বেরুতে চাইল না!

এদিকে পুলিশেরাও তখন টুটুদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে। ঘন ঘন চোখ নাচিয়ে হালুম বাঘ মাথায় চটপট এক মতলব ঠিক করে নিল। তারপর পাশের ছোট গলি দিয়ে লাগল দৌড়তে। মউ, পিউ, বুবাই ফিরছিল স্কুল থেকে। খেপা বাঘকে তেড়ে আসতে দেখে বই-খাতা ফেলে 'বাবারে-মারে' বলে ছুটে পালাল। বাঘ কিন্তু ওদের দিকে না তাকিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে গেল।

থানার বড়বাবু ওই সরু গলিতে ভ্যান ঢুকবে না দেখে টেমপোয় চড়ে তাড়া করতে লাগলেন বাঘকে। মনে মনে কলকাতার নিষ্ঠুর মানুষ-গুলোকে গালাগালি দিতে থাকল হালুম। ব্যাচারা রাজা আর দৌড়তে পারছে না কিছুতে-ই। তবু মন শক্ত রেখে জান বাঁচবার জন্যে দৌড়ে চলল। আর কলকাতার এক মুহূর্তও নয়।

চারপাশে অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমশঃ। আকাশে নিভুনিভু তারারাও জ্বলছে। হঠাৎ হালুম ফাঁকা এক মাঠ সামনে দেখল। মাঠের ওপর দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে এঁকে-বেঁকে।

হালুম ভাবল, নিশ্চয়-ই সে দাপটপুরের কাছে পৌঁছে গেছে। ওখানেও তো মাঠের বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন।

চমক ভাঙল হালুমের। কানে এল প্রচণ্ড এক শব্দও। তবে কি দাপটপুরে সে এসে পৌঁছয় নি?

পেছনে তাকিয়ে দেখে অনেকগুলো মিলিটারি গাড়ি লাল আলো ফেলতে ফেলতে আবার তেড়ে আসছে।

একটা ইলেকট্রিক ট্রেন কাছে এসে পড়ায় সে দে দৌড়ে ঝাঁপ মেরে ট্রেনের মাথায় বসে পড়ল একেবারে।

আর দাপটপুরের রাজা হালুমকে কলকাতায় দেখা গেল না। সে তার রাজ্যে ফিরে গেল।

# ন-মামুর টিয়া

ন-মামুর টিয়াটা না কি ভীষণ দুষ্টু! সেই কখন থেকে খালি ট্যাঁ ট্যাঁ করে বিচ্ছিরি ভাবে ডাকছে! একটুও ঘুমুতে দিল না। যাই, ওকে চুপ করিয়ে আসি।

সিঁড়ির এক কোণে টিয়ার খাঁচা রাখা। পম্পি ওখানটায় ছুটে গিয়ে হাঁটু দাঁড় করিয়ে বসল। আর তারপরে-ই না খুব ধমকাতে লাগল টিয়াকে,

—এই চুপ, চুপ। দাদুভাই, দিদিভাই, ন-মামু সব ঘুমুচ্ছে। চেঁচাসনে আর! মামণির ঘুম ভেঙে গেলে দেখবি বকবেখন্! চুপ চুপ।

ঠোঁটের কাছে একটা আঙুল এনে ইশারায় বোঝাল চুপ করার জন্যে। টিয়াপাখি তবু পম্পির বারণ মোটেই মানছে না। অকারণে শিস দিচ্ছে। নয়ত উঁচু গলায় ভক্তদাশ—কৃষ্ণ কথা কও, বলে ডেকে চলেছে। আরো কত কি সব, বলছে! পম্পি সব বুঝতে পারছে না।

মামুদের বাড়ি আসা অব্দি দুপুরে নিশ্চিন্ত মনেও ঘুমুতে পারছে না।

দুষ্টু টিয়াটা কেবল চেঁচায়। নিজেও ঘুমুবে না, আর কারুকেও ঘুমুতে দেবে না!

পম্পি একমনে তাকিয়ে দেখল ওকে। টিয়াপাখি কেন যেন একটু অখুশি। ছটফটিয়ে খাঁচার চারপাশে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ডানা ঝাপটে নিয়ে ডাক ছাড়ছে সমানে। টিয়াটার এত রাগ দেখে কি যেন মনে পড়ে গেছে পম্পির! সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল তরতর গতিতে।

এক দৌড়ে আবার ওখানটায় এসে বসল। ওর হাতের মুঠোর ভেতর একটা লজেঞ্চুস। ওটা খাঁচার কাছাকাছি ধরে রেখে বলল,

—আর জ্বালাস্‌নে বাপু! নে খা।

অনেকক্ষণ পর টিয়াটা লাল ঠোঁট দেখিয়ে দু তিনবার লজেন্সের গায়ে শব্দ করে ঠোকর মারল।

খেতে অসুবিধে হচ্ছে মনে হল পম্পির। বলে উঠল,

—আরে দাঁড়া, চিন কাগজটা খুলে দিই। না হলে খাবি কি করে?

লজেন্সের গায়ে মোড়া কাগজ মচমচ শব্দে খুলে খাঁচার ভেতর দিকে ধরল। আর ন-মামুর টিয়াটা না কাছে আসছে, না লজেন্সের গায়ে জিব ছোঁয়াচ্ছে!

অনেকক্ষণ সাধাসাধির পরে নিজে-ই মুখে পুরে দিল পম্পি। তারপর বাইরে এনে বলল,

—নে, এবার তুই খা!

অমনি মাথা নিচু রেখে আবার গজগজ করতে লাগল টিয়াপাখিটা। লজেঞ্চুসের গায়ে জিব ঠেকাল-ই না!

এবার পম্পিও রাগ দেখিয়ে ওটাকে মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল,

—যা তবে!

পাখিটা সত্যি এবার চুপচাপ। হুড়োহুড়ি করে পম্পি ওকে খেতে সাধল।

টিয়াপাখি কিন্তু খাঁচার ওই এক কোণে-ই রইল বসে।

পম্পি ভাবছে—

লজেঞ্চুসটা এঁটো করে দেওয়ায় টিয়া রাগ করল কি? আশ্চর্য কিছু নয়!

# সোনাই

নদীর নাম সোনাই। কুলকুল শব্দে তরতর করে বয়ে চলে নদী। পাশের গ্রামের নামও সোনাই। গ্রাম শেষ হয়ে যেখান থেকে ধূ-ধূ মাঠ শুরু, ওখানে বাঁশ-ঝাড় ঘেরা ছোট্ট একটা ঘর।

ফুলের মতন ফুটফুটে সুন্দর আট-ন বছরের মেয়ে—নাম তার সোনা, সেই ঘরে থাকে ওর মা-বাবার সংগে। নদীর নামে নাম মিলিয়ে আদর করে সবাই ওকেও সবসময় ডাকে, সোনাই।

মাঠ পেরিয়ে বন, বন পেরিয়ে পাহাড়, পাহাড় পেরিয়ে তবে এই নদী —সোনাই! দেখলে বেশ শান্তশিষ্ট বলে মনে হয়।

সকাল সকাল ঘর থেকে বেরিয়ে এখানে এসে রোজ ঘাসের সবুজ নরম বিছানার ওপর পা রেখে সোনা জিরোয়। একা একা কত সব খেলা খেলে নুড়ি-পাথর জড়ো করে।

সোনাই নদীর টলটলে জল কাচের মত-ই সাদা দেখায়। জলের ওপর বাতাস নাচলে ছোট বড় ঢেউ দোল খায়। সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ঢেউ গোণে সোনাই। ঢেউয়ের মাথায় কুচি কুচি ফেনার ছড়াছড়ি! আর চুপচাপ থাকতে না পেরে এক সময় ঢেউয়ের পিঠে চড়ে অন্য ধারে চলে যায় দুলুনি খেতে খেতে। আবার কখনও সারা শরীরে ঢেউয়ের ফেনা মেখে ঝাপুর ঝুপুর করে গা ভিজিয়ে নিয়ে স্নান সারে সোনা।

তারপর যেই স্নান শেষ, অমনি নদীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয় সোনাই।

—ওই নদী, সোনাই নদী, তোমার বাড়ি কোথায়? আজ তুমি কোন্ কোন্ গ্রামের গা ছুঁয়ে বেড়াতে গেছলে? আচ্ছা, আবার কবে সাগরের সংগে দেখা করতে যাবে?

আমাকে একদিন সাগর দেখতে নিয়ে যাবে? বল না—কবে যাবে?

—এইসব।

একদিন সোনা আসতে দেরি করল। তাই ওকে নদী জিজ্ঞেস করল,

—এই সোনা, আজ দেরি হল যে?

সোনা অমনি বলে দেয় নদীকে,

—আহা! কি করব তুমি-ই বল্? কত সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ বন পাহাড় পেরিয়ে তবে তো তোমার সংগে দেখা করতে আসি। তুমি যদি আমাদের বাড়ির ঠিক পাশ দিয়ে যেতে, তাহলে কি আর দেরি হত?

নদী সাদা সাদা ফেনায় ভরা খুশি মাখা ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে সোনার কানে চুপি চুপি কি যেন বলল!

সেই রাতে এক স্বপ্ন দেখল সোনা। ওদের বাড়ির দিকে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে আসছে সোনাই নদী।

সত্যি সত্যি হলোও তাই।

হঠাৎ আকাশ জুড়ে কালো মেঘ জমল। তারপর-ই বৃষ্টি নামল মেঘ ছিঁড়ে! সমানে বৃষ্টি পড়তে থাকল। আর তিন দিনকার বৃষ্টির জলে ফুলে ফেঁপে ভয়ংকর হয়ে উঠল নদী। সব ক'টা মাঠ ডুবিয়ে গ্রাম ভাসিয়ে সোনাদের ঘর ঘিরে কি জল! কি জল! ঘরের ভিতর হাঁটু পর্যন্ত জল ঢুকে পড়েছে।

ব্যাপারটা স্বপ্ন ঠেকল না আর সোনার কাছে।

নৌকোয় চেপে গ্রাম ছেড়ে ডাঙ্গার খোঁজে চলে যেতে লাগল সকলে। সোনার বাবা-মা কত করে বলল ওকে,

সোনা, নদীর জল আরো বাড়বে। বান ডেকেছে। তুই

ডুবে যাবি। চলে আয়। আমরা চলে যাচ্ছি। শিগগির চলে আয় সোনা।

তবু সোনাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গলা অব্দি জলে দাঁড়িয়ে থেকে বলে,

তোমাদের ইচ্ছে হলে চলে যাও। আমি কিছুতে-ই যাব না গ্রাম ছেড়ে। দেখলে ত নদী আমার কথা শুনেছে। আমাকে সাগর দেখাতে নিয়ে যাবে বলে এখানে চলে এসেছে।

একটা ঢেউ ভীষণ জোরে দৌড়ে এসে না সোনাকে পিঠের ওপর তুলে নিয়ে ছুটল।

সবাই ভাবল, তাহলে কি সত্যি সত্যি সোনাই নদী সোনাকে সাগর দেখাতে নিয়ে গেল!

# মানে

নিনা ছোট্ট মেয়ে। সাতে এবার পা দিয়েছে। ওদের বাড়ির দরজার চৌকাঠ পেরতে না পেরতে-ই দৌড়ে এল কাছে। গাল ভরতি হাসি হাসল। তুলতুলে গাল টিপে আদর করতে যাচ্ছি, তখ্খুনি বলে ফেলল—

কাকু, আমি পাস করেছি। উঁচু ক্লাশে উঠলাম এবার।

উৎসাহ দেখাতে বলি—

বাঃ খুশির কথা তো!

জানো, এবার থেকে আমাকে অনেক বই পড়তে হবে। ইংরেজী বাংলা তো আছে-ই। তার ওপর আরেকটা নতুন বিষয়ও যোগ হয়েছে।

এ কথায় আগ্রহ হল খুব। জিজ্ঞেস করি—

নতুন বিষয়! সেটা আবার কোন বিষয়?

সায়েন্স!

উরে বাপ্, এ কঠিন বইয়ের লেখাজোখা মেয়েটার মগজ দখল করবে! মুখ থেকে তাই বেরিয়ে যায়—

সায়েন্স! আচ্ছা নিনা, সায়েন্স মানে কি বলতে পারবে?

কথায় কথায় ঠিক জবাব তৈরি। কিছু না ভেবে হুড়মুড়িয়ে বলে উঠল—

সায়েন্স? সায়েন্স মানে ব্যাং কাটা, মানুষ কাটা, গাছ-পাতা কাটা। আবার কি?

এ কি বলছ নিনা!

আমার বলা শেষ না হতে, মোটকা এক বই হাতের ওপর তুলে দিয়ে বলতে থাকে—

এই ছ্যাখো সায়েন্সের বই। এটা অবশ্য দাদার। আমারটা এরকম-ই হবে দিদিভাই বলেছে।

এক এক পাতা উল্টে দেখি গাছের ছবি কয়েকটা; সত্যিকারের ব্যাংয়ের ছবি; কে কোন দেশের রাজা-মন্ত্রী আরো কি সব। আসলে বইটা জেনারেল সায়েন্সের বই—সাধারণ জ্ঞানের।

নিনার ভুল বুঝিয়ে দিতে বলি—

ব্যাং কাটা? মানুষ কাটা? এ কি বলছ, নিনা?

চটে যায় একটু। অমনি ফরসা গাল দুটো টুকটুকে লাল দেখায়। হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে তাকে রেখে এল দৌড়ে। আর এসে-ই বলল—

তাছাড়া আবার কি হতে যাবে। দাদাও ত ব্যাং কাটে, সায়েন্স বই নিয়ে ইস্কুলে যায়।

এক বন্ধু, ওর বয়সী আরেকটা ছোট্ট মেয়ে ডাকতে এসেছিল, এতক্ষণ ও দূরে দাঁড়িয়েছিল। হাত নেড়ে ডাক পাড়ে নিনাকে। অমনি নিনা সে মেয়েটার হাত ধরে কোথায় যেন চলে গেল।

আমার মাথায় তখনও 'সায়েন্স মানে ব্যাং কাটা, মানুষ কাটা, গাছ-পাতা কাটা আর কি!'—এ শব্দগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে।

এ্যাদ্দিনকার একগুচ্ছের বিদ্যে তালগোল পাকিয়ে গেল ঠিক এ-সময়!

# দুষ্টু টুসটুসি

তাড়াতাড়ি হাঁটছিল পিউ।...

ওর ঘুম আজ একটু দেরিতে ভেঙেছে। হয়ত আরও পরে ভাঙত। যদি না ওই কাকটা জানালার ধারে চিৎকার করত বিচ্ছিরিভাবে, এসব ভাবতে ভাবতে সোজা হেঁটে চলেছে পিউ।...

ঠিক এমন সময় পেছন থেকে ওর নাম ধরে কে যেন ডাক দিলে!

—কোক্কোরো-কোঁ-কোঁ। পিউ-শোন শোন।

পিউ তো অবাক! এত সকালে কে ডাকে রে বাবা! পেছন ফিরে তাকাতে-ই দেখে অমরকাকুদের বাড়ির নিচে যে মোরগটা থাকে, ওটা ওর দিকে-ই গুটিগুটি পা চালিয়ে সুড়সুড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে বললে,

—পিউ তুমি কি আমাদের ছোট ছানাকে দেখেছ?

পিউ উত্তর দিলে,

—কই, না তো!

পিউর কথা শুনে রাগ রাগ গলায় বললে মোরগটা,

—ভীষণ দুষ্টু হয়ে গেছে টুসটুসি। আসুক আজ বাড়িতে। তুমি দেখে নিওনা—ওর পিঠের ছাল তুলে তবে ছাড়ব! হ্যাঁ—

পিউ বেশ বুঝতে পারল মোরগটা খুব রেগে আছে। যাকে বলে একেবারে খাপ্পা। মিষ্টি গলায় তাই ও বলে দিলে,

—অত ভাবছ কেন? ও ঠিক-ই বাড়ি চলে যাবে।

মাথার লাল ঝুঁটি এপাশে সেপাশে বেশ দুলিয়ে দুলিয়ে মোরগ এবার বললে,

—কোক্কোরো-কোঁ-কোঁ। তুমি জান না পিউ। ও ভীষণ দুষ্টু

হয়েছে আজকাল। গেল সোমবার সবে ওর চোখ ফুটেছে। এখনও ভালভাবে রাস্তা চেনে না। তবু ঘর থেকে বেরুতে না বললেও কথা শোনে না! আসুক আজ।

পিউর খেয়াল কিন্তু তখন মোরগের কথার ওপর নেই, কি যেন ভাবছে ও। এক সময় ফিক্ করে হেসে ফেলে। বলে,

—মনে পড়ছে। আরে বলতে-ই তো ভুলে গেছি! সাদা ধবধবে ছোট্ট এক ছানা। ও-ই বুঝি তোমার ছানা?

যেই না এ-কথা মুখ খুলে বলা, মোরগটার তোষামোদ শুরু হল অমনি।

—কোথায় দেখলে, বল না পিউ?

পিউ-মৌদের বাড়ির পাশে যে তিন কোণা পার্ক আছে; তার বাইরে ঘুরঘুর করছে। কত বললাম, টুসটুসি বাড়ি থেকে একা বেড়িয়েছিস্ কেন? অননি টাসটাস জবার দিলে,

—তোমার তাতে কি? আমি খাবার খুঁজছি।

একথা বলতে-ই, মোরগটার রাগ আরো বেড়ে গেল। প্রচণ্ড রেগে পিউকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে,

—বোকাটার ওরকম-ই স্বভাব। ঘুরে ঘুরে শুধু রাস্তার আজে বাজে খাবার খাবে।

ঠিক সে-সময় না কি হল জানো?

পিক্-পিক্ করে ডাকতে ডাকতে ছোট এক মোরগছানা পিউর পায়ের কাছে এসে ঘুরঘুর করতে লাগল। আর মাথা নিচু রেখে বললে,

—তুমি তো ভীষণ দুষ্টু পিউ। নালিশ করে দিলে! এখুনি মা আমাকে পিটুনি দেবে'খন্। কাউকে মার খাওয়াতে তোমার ভাল লাগে। না?

মোরগটা এক ঝাঁপ দিয়ে ছানাকে ধরে ফেলল! আর ধারাল ঠোঁট দিয়ে ছানাকে যেই ঠোক্‌রাতে গেছে, অমনি পিউ হাঁটু গেড়ে টুসটুসিকে হাতের উপর তুলে নিল।
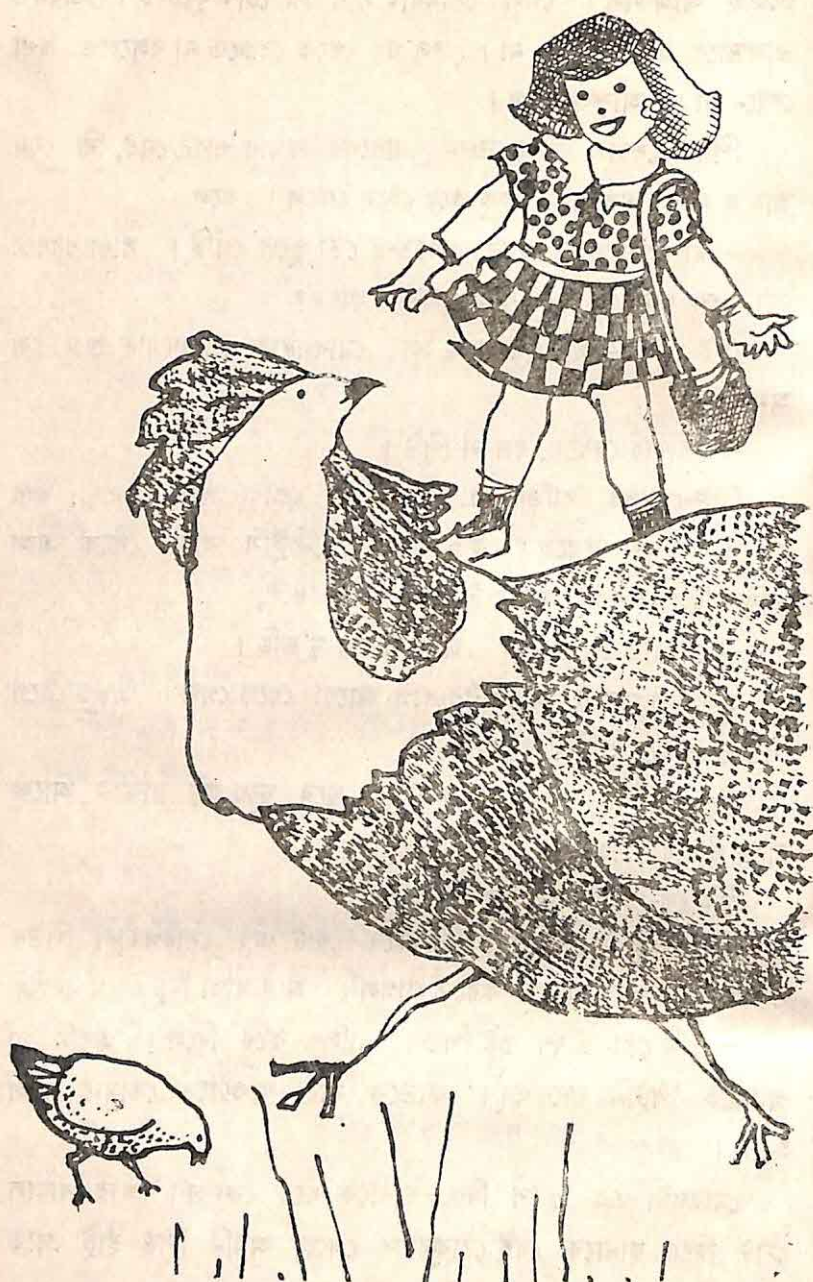
পিক্ পিক্ করে ডাকতে ডাকতে ছোট্ট এক মোরগছানা.....

অমনি বলে উঠল মোরগটা,

—ছেড়ে দাও পিউ। ওকে আজ একটু শাস্তি দিতে-ই হবে। ভীষণ বাড় বেড়ে গেছে। বড়দের মুখের ওপর তর্ক করতে শিখেছে।

ভয় পেয়ে টুসটুসি সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল। পিউ বেচারার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে,

—আর অবাধ্য হবি, বল্ ?

টুসটুসি কান্না জড়ানো গলায় উত্তর দিলে,

কখ্খো-নো-না।

পিউ টুসটুসিকে নাবিয়ে দিল আলগোছে হাতের ওপর থেকে। আর মোরগটার দিকে চেয়ে বললে নরম গলায়,

— আচ্ছা, এবারের মত ওকে মেরো না।

মোরগটার রাগ পড়ে গেছে ততক্ষণে। সে বললে তাই,

—তুমি যখন বলছ, তখন আজ আর মারব না পিউ।

তারপর ?

তারপর মোরগ ওর ছানাকে নিয়ে হাঁটি হাঁটি পায়ে চলে গেল বাড়ির দিকে। পিউও পড়ার কথা ভাবতে ভাবতে স্কুলের দিকে চলল।···

স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে কি ভেবে ও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অবাক হয়ে।

তাই তো, মুরগিদের সঙ্গে সত্যিই পিউ কথা বলছিল নাকি !

# টুসি

এক শিকারী এল পাহাড়ে। চারপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজেও চোখে পড়ল না কোনো শিকার। রোদ বাড়তে শেষঅব্দি সোজাসুজি দাঁড়িয়ে থাকা গাছের ছায়ার নিচে একটু মাথা কাত করতে চোখ জড়িয়ে গেল ঘুমে।

ছোট এক কাঠবিড়ালি, নাম তার টুসি, সবে দৌড়তে শিখেছে একটু মা-বাপ শুয়ে আছে দেখে জাম গাছের ডগায় উঠে কেউ ওকে দেখছে কি না দেখার জন্যে তাকাল নিচে। যেই না তাকানো, অমনি ভীষণ ভাল লাগল শিকারীকে। বিশেষ করে ওর বিচিত্র সাজপোষাক। হাঁটু পর্যন্ত বেড় দিয়ে লাল সালু কাপড় পরা। মাথায়ও পাগড়ি করে লাল কাপড় জড়ানো। তার ঠিক মধ্যিখানে গুঁজে রাখা গোলাপী পালক একটা। খালি গা। বেশ কায়দা আছে ঝুলিটার। রং-বেরংয়ের কাপড় জুড়ে জুড়ে তৈরী!

ডালটা না এক্কেবারে কচি। টুসির ভার সইতে পারে না এমন। পড় তো পড় শিকারীর মুখ খোলা ঝোলায় টুপুস করে পড়ে গেল। বেরিয়ে আসতে পারে না আর কিছুতেই। তাই নিজের মনে টুসি গাল দিতে থাকল নিজেকেই।

ঘুম ভাঙতে শিকারী দেখে অন্ধকার নামছে পাহাড়ী পথে। ঝোলা-ঝুলি গুটিয়ে নেমে এল সে নিচের ঢালু রাস্তায়। সেখান থেকে সোজা বাড়ি।

সেদিনও রোজকার মত শিকারীর ছোট মেয়ে ছুটে এল বাবা কি আনল দেখতে। আর ঝোলার মুখ খুলে ও দেখে টুসিকে!

ওমা কি সুন্দর!

বেশ ভাল লেগে গেল সাদা কালো সমান্তরাল মোটা দাগে ভরা কাঠবিড়ালিকে। অমনি শিকারীর কাছে গেল দৌড়ে। বললে,

বাপী তুমি একে বিক্রি করে দিও না।

শিকারী ত অবাক! ওর মেয়ে, ঝুমরি কি বলছে! তাই বললে,

পাগলি আজ কিছু পাইনি রে, বিক্রি করব কি!

ঝুম্‌রিও বললে রেগেমেগে,

দূর কি যে বলছ না! বলতে বলতে ঝোলাতে মুখ রেখে দেখে নিল কাঠবিড়ালিটা ঠিক আছে কিনা!

ওই ত আছে! ওর বাবার কাছে ঝোলাটা নিয়ে গেল। চোখ নামিয়ে যেই না দেখা— শিকারীর চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম!

এ কি, এ এল কোথেকে!

শিকারে গিয়ে কখন পেল একে? যাক্‌গে—কিছু একটা যখন মিলেছে, ভালই হল। দু'সিকি অন্তত পাওয়া যাবে হাটে বিক্রি করলে।

কিন্তু তা আর হল না। ঝুম্‌রির বায়না, টুসিকে পুষবে, আদর করবে সে।

টুসি কোথায় গেল!

টুসি কোথায়?

গোটা পাহাড় ঘিরে খোঁজা-খুঁজি। এগাছ থেকে ওগাছে মুখ বাড়িয়ে, দৌড়াদৌড়ি করে খবর নিল বুড়ো কাঠবিড়াল, কাঠবিড়ালি। গাছেরাও ভাবতে ভাবতে বলাবলি করল নিজেদের ভেতর।

এত চিন্তা করতে দেখে জাম-গাছের কচি পাতারা ঝিরঝির করে কেঁপে উঠে কাঠবিড়ালিকে বলে ফেলল,

তোমাদের টুসি বাছা দুপুরবেলা জাম গাছে উঠেছিল সেদিন, পা ফসকে ঢুপ্ করে পড়ে গেছে এক শিকারীর ঝোলায়। আমি

নিজের চোখে দেখেছি। বেশ হয়েছে, জাম চুরি করতে এসেছিল ত! চুরি করলে শাস্তি হয়, টুসি কি জানে না ?

কাঠবিড়ালি কেঁদে কেটে চোখ ভিজিয়ে বললে—

আহা! ওরকম বলবে না তোমরা। বাছা আমার কদ্দিন কোল ছাড়া হয়েছে।

জাম গাছের পাতা ফুরফুরে বাতাসে দোল খেয়ে গলা নরম করে বললে, এবার,

এক সঙ্গে সব থাকি। আমরা কি সত্যিসত্যি তোমার বাছার শাস্তি চেয়েছি ? তুমি কেঁদো না, একদিন না একদিন ওই শিকারী নিশ্চয়ই আসবে। তখন আমরা তোমাকে ঠিক বলব।

কোন্ শিকারী ? কোথায় বাড়ি! নাম-ঠিকানা কেউ পারল না বলতে।

এদিকে দিন যায়, রাত যায়। টুসি ঝুম্‌রির আদর পেয়ে বড় হয়েছে। স্বাস্থ্য ওর ভাঙেনি। বরং নাদুস-নুদুস হয়েছে দেখতে আগের থেকে। বাড়ির কথা মনেই আসে না টুসির।

•

আবার একদিন শিকারী ওই পাহাড়ে উঠল শিকার খুঁজতে। আজও ওর ফাটা কপাল। যাকে বলে একেবারে মন্দ। শিকার কোথায়—বুনো খরগোস, সাপ, হরিণ, পাখি কিছুই নেই। সব হাওয়া।

হঠাৎ হু-হু করে বাতাস বেরিয়ে এল। এ কি, গাছের শরীর কেন কাঁপে থর-থরিয়ে ? পাতারা-পাতারাও! বুড়ি কাঠবিড়ালি বিরাট পাথরের এক চাঁইয়ের নিচ থেকে ( ওখানেই ওদের বাড়ি যে! ) মাথা তুলল। অমনি জাম পাতারা ফিসফিসে গলায় বললে,

এই সেই শিকারী। ছাখো না আবার কাকে ধরতে এসেছে! এর ঝোলার ভেতরেই টুসি পড়ে গেছল সেদিন! আমি নিজের চোখে দেখেছি। হ্যাঁ—

বুড়ি কাঠবিড়ালি চোখ দিয়ে ভাল দেখে না। বয়স হলে যা হয়!

দৌড়তেও পারে না খুব জোরে। অনেক কষ্টে সর্দারের কাছে গিয়ে সব জানাল। সর্দার যা দেখতে না! দুপারে ঘুঙুর পরা। পায়ে-পায়ে ঝুম ঝুম শব্দ বাজে। কি তার মেজাজ, কি তার ভারিক্কি চেহারা! কাচের পুঁতির মত চকচকে চোখ লাল টকটকে, কি যেন বললে পাশে বসে থাকা কাঠবিড়ালিদের। অমনি ঝুপুর ঝুপুর করে নাচতে শুরু করল সব কারুর কোন বিপদ হলে এটাই এখানকার নিয়ম। নাচের শব্দ কানে গেলে তিড়িং তিড়িং মাথায় বুদ্ধি খেলে যায় সর্দারের।

এদিকে শিকারী কাঠ-ফাটা রোদে হন্যে হয়ে ঘুরে জিরোতে বসল। ভাবল, এক চোট ঘুমিয়ে নিয়ে উঠে আবার শিকার খুঁজে দেখবে। বেলা ফুরোতে ঢের বাকি!

চোখ বুজে এসেছে কি আসেনি, হঠাৎ এমা কি কাণ্ড! তুমুল ঝড় উঠেই থেমে গেল। শিকারী দেখে, সামনে পেছনে গাছেরা উপুড় হয়ে পড়ে থেকে পথ আগলে রয়েছে। ডিঙিয়ে যাবার উপায় নেই। খাড়া পাহাড়ের পাথর ফসকে একবারে খাদে—। ওর ভয় ভয় করছে। যে শিকারীকে দেখে সবাই ভয় পায়, এখন সে-ই ভয় পেয়ে গেছে সব কাণ্ড দেখে।

ওপরে সারির গাছের ডাল থেকে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে কাঠবিড়াল-কাঠবিড়ালি হাঁক দিল, টুসি কোথায়—আমাদের টুসি? টুসিকে আমরা ফেরত চাই।

এদের কথা বুঝল না শিকারী। তবে এদের দেখে ওর মনে পড়ল টুসির কথা। এ পাহাড়েই থাকত সে।

তাই ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল শিকারী, ফিরিয়ে দেব, ফিরিয়ে দেব তোমাদের কাঠবিড়ালিকে।

বাড়ি ফিরে এসে ঝুম্‌রিকে সব বলে দিলে শিকারী। সে সব কথা শুনে ঝুম্‌রির কি কান্না! না, সে কিছুতেই ফিরিয়ে দেবে না। আর যাই হোক, টুসিকে সে পুষছে কতকাল ধরে, ছেড়ে দিতে ত কষ্ট হবেই।

বাড়ি ফিরে এসে ঝুম্‌রিকে সব বলে দিলে শিকারী।

কি আর করে শিকারী, ওই পাহাড়ের দিকে পা ফেলবে না আর, মনে মনে এ-কথা ঠিক করলে।

শিকারী আসে না, টুসিকেও ফিরিয়ে দিল না। আবার তাই সব চিন্তায় পড়ল। একটা পাখি—কুটুম পাখি নাম। কুটুমের সব দেশের সব মানুষের ঠিকানা ঠোঁট পর্যন্ত মুখস্থ, ও-ই বলে দিল শিকারীর ঠিকানা।

একদিন ঝুম্‌রি স্নান করতে পুকুরে এসেছে। পায়ে দড়ি বাঁধা টুসিও সঙ্গে। গাছের ডালে দড়ি জড়িয়ে রেখে ঝুম্‌রি পুকুরে পা ডুবিয়ে জল-আয়নায় নিজেকে দেখছিল। এমন সময় ঘন হয়ে কয়েকটা ছায়া চোখে পড়তে পেছন ফিরে দেখে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে কাঠবিড়ালি কাঠবিড়াল।

এতজনকে দেখে প্রথমে ঝুম্‌রি ত ভারি খুশি। কিন্তু এ কি! ওরা সবাই চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কেন? বলছে আবার, টুসি কোথায়? টুসিকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে একজন চেঁচিয়ে উঠলে,

ওই ত। ওই ত আমাদের টুসি!

ঝুম্‌রি কেঁদে ফেলল ভয়ে। বললে,

বারে, আমি কি জানি। আমার বাপী এনে দিয়েছে একে। তোমরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন?

দাঁত দিয়ে পাতলা দড়িটা কুচি-কুচি করে কেটে দিল ওদের একজন। টুসি কিন্তু চোখ ছলছল করে কাঁদতে থাকা ঝুম্‌রির কাছে এসে লেজ ঘুরিয়ে আদর দেখিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তারপর-ই না সেই সর্দারের পিঠে সুড়ুত করে লাফ মেরে উঠে চলে গেল সোজা পাহাড়ে!

# পাহারাদার

দিন দুই আগে খুব জ্বর এসেছিল। আর ওই অসুখ নিয়ে হাসপাতালে এল মিঠুন। জ্বর কমতে ও পাশের ঘরগুলোয় ঘুরে বেড়ালো। ওর সমান বয়সী ছোটরা এ ঘরটা আর বাঁ পাশের ঘর দুটোয় রয়েছে। সবার চাউনিতে অসুখ-বিসুখের ছাপ লক্ষ্য করল মিঠুন। সুন্দর সুন্দর মুখগুলো ভাঁজে ভরতি। কিরকম যেন দুঃখদুঃখ ভাব সারা মুখের ওপর।

ডাক্তারদের কাছ ঘেঁষে জানতে চাইল ও কার কি অসুখ। শুধু অসুখের নাম জানতে চেয়েই মিঠুন চুপ করে। কেন যে অসুখটা হল, আর কবেই বা পালাবে, তা একবারও জিগ্‌গেস করে না।

একজন কিন্তু সব সময় এ হাসপাতালটা চোখে-চোখে রাখে বিশেষত ছোটদের বিভাগটা। সে বহুদিনের পুরনো বুড়ো বেড়াল একটা। কবে যে হুট করে এসে পড়েছিল হাসপাতালের ভেতর, তা টের পাই নি কেউ-ই। সেই থেকে রয়ে গেছে। এর-তার কাছে ঘুরঘুর শুধু; যা পায়, তা-ই খায়।

দিনকে দিন বয়স বাড়তে থাকে। তবু কেন যেন বেড়ালটা মিঠুনের মত-ই রোগা! ও ঘুমোলে বেড়ালটা জানালায় উঠে বসে থাকে। দিন-দুপুরে খাবার চায়। কখনও পিঠের অর্দ্ধেকটা মাটিতে, বাকী দিক দেয়ালে দিয়ে থাবাদুটো উঁচুতে তুলে মিয়াও-মিয়াও করে সবাইকে ডাকে।

মামণি বিকেলে এসে যা খাবার দিয়ে যায়, তার কিছু মিঠুন ওকে দেয় ডেকে ডেকে।

মিঠুনের জ্বরটা কিন্তু সত্যি সত্যি পালায়নি। ঘোরাঘুরি করায় আর নানা রকম ভাবতে থাকায় জ্বর আবার এল।·· দেখা দিল সারা গায়ে কাঁপুনি। ডাক্তারদের সমস্ত চিন্তা থামিয়ে দিয়ে রাত করে মিঠুন চলে গেল আরেক দেশে। ও দেশটা অন্ধকারের ওপারে।

ভোর হতে বাড়ীর লোক এসে মরা মিঠুনকে নিয়ে গেল।

ঝাড়ুদার জানালায় মুখ গুঁজে থাকা বেড়ালটার পেটে এক খোঁচা দিতে বেচারী লাফিয়ে নেবে গেল। গোটা মুখটা ওর জলে ভেজা। রাত থেকে ও মুখ গুঁজেই কাঁদছিল।

# সকালের গল্প

ভোর হয়ে আসছে।...

চারপাশে আবছা অন্ধকার অন্ধকার ভাব তবু রয়েছে এখনও।

জানালার ধার ঘেঁষে বসে আছে টিংকু। ওর মন কেন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। একা চুপচাপ তাই বসে। তার ওপর আজ আবার রোববার যে! স্কুলে যাবার তাড়া নেই। বেশ হয়েছে, আজ আর ভূগোল মাষ্টারমশায় ওকে পড়া জিগ্‌গেস করতে পারবে না। কান ধরে কাউকে দাঁড়াতেও বলবে না!

স্কুল বন্ধ থাকলে অবশ্য রোজকার মত বাপী, রিংকু, তুতুলের সঙ্গে টিফিনের সময় গল্প করতে পারবে না। কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলতেও পারবে না মোটে-ই।

এসব এলোমেলো কথা টিংকু যখন খুব ভাবছিল, ঠিক অমনি সময় ও দেখল - গায়ে ধবধবে সাদা কাপড় জড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে একটা বুড়ি তুতুলদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। বুড়িমার পেছন পেছন ভিড় করে আছে একরাশ কুয়াশাও।

টিংকু জিগ্‌গেস করলে,

—তুমিই কি শীতবুড়ি?

নিম গাছের কচি পাতা ফুরফুরে বাতাসে হুলিয়ে হুলিয়ে বুড়িটা উত্তর দিল,

—তুমি আমায় চিনলে কেমন করে?

টিংকু এবার অবাক গলায় বললে,

—বারে! তোমায় চিনব না? তুমি যে শিরশিরে বাতাস বইয়ে এলে!

শীতবুড়ির সঙ্গে আলাপ হতেই টিংকুর ভালো লাগল। মনের ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা গেল কেটে। একসময় ও বললে,

—শীতবুড়ি ও শীতবুড়ি, তুমি আর কতক্ষণ থাকবে? দেখছ না ওই পেঁপে গাছটার ওপর ছোট চড়ুইটা শীতে কিরকম করে কাঁপছে! শীতের কোন জামা গায় দেয় নি, ওদের কি এত ঠাণ্ডা সহ্য হবে?

টিংকুর কথা শুনে শীতবুড়ি এগিয়ে যেতে যেতে বললে,

--এই যে চলে যাচ্ছি ভাই! বয়স হয়েছে তো, ভাই তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না।

তারপর কিন্তু সত্যি সত্যি শীতবুড়ি চলে গেল। অমনি দেখা দিল ফুটফুটে সকাল। এক্কেবারে ঝকঝকে সকাল! অন্ধকার অন্ধকার ভাবও সরে গেল দূরে।

সোনামাখা ঝলমলে রোদ্দুর লুটিয়ে পড়ল গাছে গাছে···পাতায় পাতায়। মুক্তোর মত ফোঁটা ফোঁটা শিশির টুপ্ টাপ্ ··টুপ্ টাপ্ করে ঝরছে টিনের চাল দিয়ে—আর গাছের পাতা বেয়ে। পেঁপে গাছটা না শিশিরের জলে স্নান-ই করে উঠেছে একেবারে! তাই ওর শরীর ভিজে ভিজে। ওই পেঁপে গাছটায় সত্যি সত্যি এক চড়ুইও বসে।

এক একবার চড়ুই গাছের মাথায় বসছে, আবার একটুবাদে-ই ফুড়ুত করে অন্য কোথায় যে উড়ে যাচ্ছে! চড়ুইটার ছটফটানি থামতে চাইছে না। ও পিটপিটে চোখে মিটমিটিয়ে তাকাতে-ই দেখতে পেল—বিরাট হাই তুলতে তুলতে একটা মিনি বেড়াল আসছে।

বেড়াল চড়ুইকে দেখে-ই বলে উঠলে,

—হ্যাঁরে চড়ুইভাই, এতখুশি কেন আজ? এ সাতসকালে আবার কি হল?

চড়ুইপাখি কিচির মিচির করে উত্তর দিলে,

—ভীষণ শীত শীত করছে। তাই এমন দৌড়ঝাপ দিয়ে শরীর গরম করে নিচ্ছি। মিনি তুমিও দৌড়াবে না কি? আর যা-ই বল দৌড়ে তুমি কিন্তু হেরে ভূত হয়ে যাবে।

বলতে বলতে একপাক ঘুরে এসে আবার বসল পেঁপে গাছটায়।

এবার মিনি বেড়াল বললে,

—আর বলিস না ভাই। কাল পুপুদের বাড়িতে মাছের কাঁটা চুরি করতে গিয়েছিলাম। রাত-তুপুরে ফেরার সময় রাস্তায় এক সেপাই পাকড়াও করলে।

তারপর ?

মিনি বললে,

—তারপর আবার কি ? বেশ করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিলে। মারের চোটে হাড়গোড় পর্যন্ত কেমন নরম নরম হয়ে গেছে যেন। কি ব্যথা যে—। উঃ—

চড়ুইপাখি বেড়ালের নাকিসুরের কান্না শুনে তো হাসিতে লুটোপুটি খেতে লাগল।

বেড়াল এবার বলে উঠল,

—আচ্ছা চড়ুই, কটা বাজে বল তো ?

সূয্যিমামার দিকে তাকিয়ে চড়ুই কি যেন দেখলে। কিচির মিচির করে কিসব জিগ্‌গেস করলে, তারপর-ই বললে,

—এই ছ'টা হব হব করছে।

কথা শুনে মিনি বিড়াল চমকে উঠল যেন! অমনি পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করে দিল। আর বললে,

যাই দেখি হুলো বেড়ালের ডাক্তারখানায়। ও হয়ত একটা ভাল টনিক দেবে। দেরি হলে লাইনে দাঁড়ান-ই যাবে না। যা ভিড় হয় না হুলো বেড়ালের ডাক্তারখানায়! চলি এখন, আবার পরে দেখা হবে।

টিংকু কিন্তু জানালা দিয়ে এতক্ষণ এসব দেখছিল ঠিক। হঠাৎ ও হেসে উঠল খিলখিল করে।

কেন ?

দুধের মতন ধবধবে দুটো ছোট্ট মোরগছানা পা টিপে টিপে ওদের বাবার সঙ্গে যাচ্ছে যে!

কোক্কোরো কোঁ—

মোরগটা কাছে এসে বললে,

—টিংকু তুমি দেখছি ঘুম থেকে উঠে পড়েছ। ভাল-ই হল। ছানা দুটো তোমার কাছে থাক। আমি চটপট বাজার সেরে আসি। যা দুষ্টু হয়েছে এরা!

টিংকু বললে,

—ঠিক আছে, থাক না ওরা। আমার সামনে-ই খেলা করবে'খন।

কোক্কোরো কোঁ—কোঁ, ঠিক আছে—ঠিক আছে। বলতে বলতে চলে গেল মোরগটা।

টিংকু ছানা দুটোর দিকে তাকিয়ে ছড়া কাটল:

গুটিগুটি
ছোট্ট দুটি
মোরগছানা ওই,
এই শীতেতে
হ্যাঁরে তোদের
গরম জামা কই?

অমনি একটা মোরগছানা সামনে এসে জবাব দিলে:

কি করব বল না ভাই
পয়সা কোথায় পাব?
হাড় কাঁপানি শীতবুড়ি
বলছে 'খাব—খাব'।
পিক · পিক···পিক···।

কথা শুনে টিংকুর ভীষণ কষ্ট হল। ইস্ মোরগ ছানাদের গায়ে এখনও ভাল করে পাখা গজায় নি। শুধু ছোট ছোট দুটো পাখনা।

আকাশটাও হঠাৎ কেমন মেঘলা মেঘলা হয়ে গেল। ঠাণ্ডা তো লাগবেই।

টিংকু বললে :

—বলি তোদের মা'র কি আক্কেল।
দাঁড়া তোরা ভাই
দেখি না কি পাই!

টিংকুর কথায় মোরগ ছানারা আনন্দ পেল। ওরা খুশিতে বারান্দার ওপরে দৌড়-ঝাঁপ দিতে লাগল। আর টিংকু ঘরে গিয়ে পুরনো জামা খোঁজা শুরু করল। কিন্তু—কিন্তু কি? ওর যা পুরনো জামাপ্যান্ট ছিল, তা দিয়ে বাসনওয়ালার কাছ থেকে মা যে গেল কাল-ই থালা রেখেছে।

টিংকু কি করে এখন? একটা বুদ্ধি অবশ্য মাথায় এল।

কিন্তু যেই না ও পুরনো কাপড় ছিঁড়তে লেগেছে, অমনি শব্দ শুনে মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। ধমকানি দিয়ে বললেন,

—কাপড় ছিঁড়ছিস্ কেন?

কাঁদো কাঁদো গলায় টিংকু বললে,

—দাও না মা একটুখানি।

মা রাগ রাগ গলায় এবার বললেন,

—কাপড় দিয়ে কি হবে শুনি?

টিংকু বললে,

—দরকার আছে।

মা আবার ধমকানি দিলেন,

—না, পাবি না। যা—

কি আর করে টিংকু। গোমড়া মুখে ঘর থেকে এল বেরিয়ে। ওকে দেখতে পেয়ে মোরগছানা ছুটে যায় টিংকুর কাছে। ভুলে গেল খেলা।

টিংকু কিন্তু তখনও ভাবছে—কনকনে ঠাণ্ডায় বেচারা ছানারা কষ্ট

পাচ্ছে, আর ওর গায়ে তু-তুটো জামা ? একটা জামা খুলে ওদের দিতে গেল টিংকু ।

মোরগছানা অমনি বলে উঠল—

না, আমরা তোমার জামা নেব না ।

ঠিক তখন-ই টিংকুর মনে পড়ে গেছে কি যেন ! গেল রোববার ওর চিনে-মাটির পুতুলের বিয়ে গেছে না ! সে-সময় ওর বাপী তুটো রঙীন রুমাল পুতুল তুটোকে দিয়েছিল ।

বাকসের ভেতর পুতুলরা শুয়ে আছে । ওদের তাহলে ঠাণ্ডা লাগবার কথা নয় । ইস্, এদিকে যে ছানারা ঠক ঠক করে কাঁপছে শীতে ! এদের জন্যে এখ্খুনি একটা কিছু করতে হবে । নইলে শীতে কষ্ট পেয়ে মরেই যাবে ।

ভাবতে ভাবতে টিংকু কাঠের বাকস খুলে রুমাল তুটো নিয়ে এল । তারপর-ই ওদের দিকে ওগুলো উড়িয়ে দিয়ে বলল :

আয় তোরা কাছে আয়
দিই গায়ে জড়িয়ে,
এখ্খুনি শীতবুড়ি
ঠিক যাবে পালিয়ে ।

ওরা কাছে এল । টিংকু ওদের গায়ে ভাল করে জড়িয়ে দিল রুমাল।

এদিকে মোরগটা বাজার থেকে ফিরে এসেছে ততক্ষণে । ও তো ভীষণ অবাক ! সত্যিকারের জামা গায়ে দিয়ে সাজুগুজু করে বসে থাকা ছানাদের জিগ্গেস করলে,

—তোদের গায়ে এগুলো জড়িয়ে দিল কে ? টিংকু বুঝি !

ছানারা পিক্ পিক্ করে উত্তর দিলে,

—টিংকুবাবু—টিংকুবাবু ।

মোরগ না বলে পারলে না ।

টিংকু তোমার মনটা ভারী সুন্দর । একটা ধন্যবাদ তো তাহলে দিতে হয় ।

বড় মোরগের মনের ভাব বুঝতে পেরে টিংকুও হাসি হাসি মুখে বললে,

—আমার আছে তাই দিলাম। তার জন্যে ধন্যবাদ দেবে কেন?

তবু মোরগ বললে,

—না দিয়ে কি পারি! আচ্ছা, চলি। ছানারা এখনও পর্যন্ত কিছু-ই খায় নি।

মোরগটা ওর বাচ্চাদের নিয়ে তুতুলদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল।

ঘরের ভেতর থেকে মার ডাক কানে এল টিংকুর,

—টিংকু জানালার ধারে বসে থেকো না। খেতে এস।

## ল—ব—ড—ঙ্কা

বর-বউয়ের ছবি আঁকা চিঠি হাতে করে হাঁফাতে হাঁফাতে অজা এসে তাড়াতাড়ি বলে ফেলে,

—তোমার চিঠি বাবা।

কথা শুনে গজাবাবু হাত বাড়িয়ে খোঁড়া চশমার সরু এক ঠ্যাং কানের ধারে গুঁজতে গুঁজতে গম্ভীর গলায় শুধালেন,

—কিসের চিঠি আবার ?

একটু পর সে চিঠির বিষয় বুঝে ফেলে কপাল এবং ঠোঁটের দু-ধার সামান্য ছড়িয়ে রেখে বললেন,

—আরে, তোর শুঁটকিদির বিয়ে যে ! দারুণ একটা খবর পাওয়া গেল এ্যাদ্দিনে।

তখনও ওর কথা শেষ হয়নি। ছোট ছেলে ভজা চুপি চুপি কাছে এসে দাঁড়ায়, খুব আশা নিয়ে জানতে চাইল ও।

—আমি একটা কথা বলব ?

—কি !

—কবে নেমন্তন্ন খাব বাবা ?

আদর করার ছলে গজাবাবু জোরসে তিন কিলো ওজনের এক কিল বসিয়ে বললেন,

—হতচ্ছাড়ার দল, নেমন্তন্নের নাম শুনে উড়ে পড়ে যেন ! সব কাজে অস্থিরতা, তোরা কি রাস্তার নেড়ি কুত্তা, খাবারের নাম শুনে জিব বার করে ছুটে আসিস যে ! যা পড়তে—

বাড়ির কর্তার লাফঝাপ আর ভীষণ চিৎকার কানে পৌঁছতে হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন গিন্নী,

—কি হয়েছে, এত হইচই করা কেন ?

ঘাড়ের কাছেকার চুলে বেশ কিছুক্ষণ সুড়সুড়ি দিতে দিতে আগের মত উঁচু গলায় বলে চললেন,

—আর বল কেন, তোমার কীর্তি ছাড়া হতভাগা ছুঁচোদের কথা!

গজাবাবুর ছুঁচল কথার চোটে বাড়ির গিন্নীর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়।

—কি বললে?

তড়বড়িয়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন গজাবাবু, ভজা এ সময় প্রচণ্ড গলায় বললে,

—বাবা, বাবা—

—কি হয়েছে রে?

—কার্ডে কি আবোল তাবোল ছেপেছে, দেখো দেখো—

ভজার কথায় ঘরের দু পা বিশিষ্ট সকলে ছানাবড়া চোখে কার্ডের শেষ লাইনে তাকিয়ে মা ভৈঃ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে,

—'লৌকিকতার পরিবর্তে রেশন অগ্রিম পাঠাইবেন'।

গিন্নী তখ্‌খুনি মাথা নেড়ে মন্তব্য না করে থাকতে পারলেন না।

—আমাদের সময় বিয়ের কার্ডে এমন ত ছাপা হত না!

অজা বললে,

—বাবা, আমি একবার শুঁটকিদিদের বাড়ি যাব?

ছেলের কথা শুনে গজাবাবু ছোট্টদের মত সাদা জিভ দেখিয়ে ভেংচি কেটে বললেন,

—মাতব্বরি করিস্ না। যা করার, তা আমি করব। ওখানটাতে রেশনের পরিবর্তে আশীর্বাদ হবে, সে কথা সবাই বুঝবে। তোরা শুধু—

গজাবাবুর কথা শেষ হল না, ভজার মুখ ফসকে চাপা দেওয়া কথা সে-সময় বেরিয়ে পড়ে।

—কি খাওয়াবে তোমার কিছু আইডিয়া আছে বাবা?

অমনি ভজার মা-ও একটু আহ্লাদের গলায় বললেন আগ্রহ নিয়ে,

—রাধাবল্লভি আর ঘেঁট তরকারি। তাছাড়া এ-ব্যাপারে শুঁটকির বাপ কি খাওয়াতে যাবে?

গিন্নীর এ-কথায় কর্তাবাবু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। দাঁত ছরকুটে উনি বললেন সঙ্গে সঙ্গে,

—দু টাকা দামের কাচের তাজমহল দিয়ে যদি তিনজনে মিলে দশ টাকার খাবার খেতে পারি, তবে মন্দ কি?

অগত্যা গিন্নী কর্তাবাবুর নেমন্তন্ন রাখার কায়দা দেখে মুখ ফুলিয়ে চোখ দুটি সামনের দিকে বার করে ওখান থেকে সরে পড়লেন। অজা-গজাও ব্যাপার বুঝে নিয়ে ধড়ফড়িয়ে বই খাতায় চোখ রাখল আর কেঁচে গণ্ডূষ শুরু করে দিল।

পরের দিনের কথা। সন্ধের আকাশ একটু কালো হয়েছে, এর মধ্যে তিন মূর্তি গিয়ে হাজির। কিন্তু এ কি দেখছে! এমন ফাঁকা থাকে বিয়ে বাড়ি? তাই ত!

ভীষণ মুষড়ে পড়ল অজা-ভজা। গজাবাবু তবু নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সগর্বে নহবৎখানা পেরিয়ে শ্রীমানদের নিয়ে সদর দরজায় ঢুকতে যাবেন যেই, জোড়া জোড়া পা গেল থমকে। মুহূর্তের মধ্যে গজাবাবুর ঝকঝক্ করা চোখ দুটি চমকে উঠে বিদ্রোহ দেখায়,

—এ কি করছ ভাই?

—কার্ড দেখান।

এদিকে অজার বুদ্ধি ঠিক হয়ে গেছে মনের মধ্যে।

—নেমন্তন্নের কার্ড কি মশায় গেটে দেখাতে হয়? এটা কী খেলার মাঠ, না—সিনেমা হল্?

গজাবাবুর বিরাট শরীরের চওড়া ঢাউস পেট থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। গলাও কাঁপে একটু।

—থাম তুই।

এই বলেই উনি মস্ত মাথা পেছনে ঘুরিয়ে বললেন,

—ভেতরে যেতে দাও, নয়ত বলহরিকে ডেকে আন।

গেটকিপার এবার নিজের গুরুত্ব এদেরকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বলে দেয় শুধু,

—আই অ্যাম অল ইন অল অফ দিজ্ ম্যারেজ সেরিমনি। কার্ড না দেখালে ঢুকতে পারবেন না।

ভজার পক্ষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। এদিকে গেটকিপার ছেলেটি ওপরে মুখ তুলে আকাশের তারা ক'টা উঠল, গুনছিল। হাতক'দূরে পড়ে থাকা কার্ডটি ওর চোখে ধাক্কা দিয়েছে, ছুটে গেল সেখানে। আর এক দৌড়ে হাতের সামনে সেটি এনে বলে উঠল,

—আরে হ্যাঁ, কার্ডটা যে আমার পকেটেই ছিল। পড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই!

তারপর সামান্য মেজাজ নিয়ে বললে,

—এই নিন আপনাদের নেমন্তন্নের কার্ড। হয়েছে?

ভজার উপস্থিত বুদ্ধি আর কেরামতি লক্ষ্য করে গজাবাবু বিস্ময় মাখা চোখে শ্রীমানের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মুচকি হাসি এসে পড়ায় ভজার মুখখানি তখন রং-মশালের মত উজ্জ্বল দেখায়।

ছেলেটি ভজার হাত থেকে একটানে কার্ড ছিনিয়ে নিয়ে বলে,

—তিনজন?

ওই সর্বেসর্বার কথার ইতি হয় নি, হঠাৎ যেন গম্ভীর গলার স্বর ভেসে এল,

কোত্থেকে আসছেন আপনারা?

—কেওড়াতলা।

—নাম?

—দরবেশ সামন্ত। আজ্ঞে ডাক নাম কিন্তু গজাবাবু।

—এবার তাহলে ডান দিকের ঘরে যান।

ভূতুড়ে গলার স্বরে গজাবাবু ততক্ষণে ভয়ে রীতিমত আশি বছরের থুরথুরে বুড়োর মত কাঁপতে শুরু করে দিয়েছেন।

নিজের গুরুত্ব এদেরকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বলে...

অজা ওর বাবার সিরিয়াস্ অবস্থা দেখতে পেয়ে বলে ফেলল তাড়াতাড়ি,

—ও মশাই, ডানধারের ঘরে পরে যাব 'খন্। আগে একটু জল নিয়ে আসুন না, আমার বাবার মাথাটা বোধহয় কেমন কেমন করছে। এখ্খুনি হয়ত মাটিতে গড়াগড়ি যাবে!

এক নিমেষে বাড়ির দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেটি। ওদের সবার চাউনি কিন্তু ঘোরাফেরা করছিল বিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে। পেটুক ভজা নাক টেনে টেনে বারবার খাবার-দাবারের গন্ধ নাকে নিচ্ছিল। ওর শুকনো জিবের সামনাসামনি ক'ফোঁটা জলও বুঝি এসে পড়েছিল।

গজাবাবুর মাথার কাঁপুনি, টলমলানি কিন্তু থেমেছে। সুযোগ দেখে বললেন ওদেরকে ফিস্ফিসিয়ে।

—চল্, পালাই। এখুনি আবার ডান ধারের ঘরে রেশন চেয়ে বসবে। বিশ্বাস নেই কিছুর।

অজা আর ভজা এবার নেমন্তন্নের কার্ডে লেখা 'রেশন অগ্রিম পাঠাইবেন' কথার ঠিক ঠিক মানে বুঝতে পারে। তাই গলা মিলিয়ে মিলিয়ে একসঙ্গে জানায়,

—তাই চল বাবা।

তিনমূর্তি তাড়াতাড়ি পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসছিল। এমন সময় জ্যান্ত বলহরিবাবুকে সোজা শরীর নিয়ে আসতে দেখে গজাবাবু দৌড়ে তার কাছে সরাসরি গেলেন। অভিযোগের সুরে বলে উঠলেন তারপরই,

—ভাইরে, মা শুঁটকির বিয়েতে এসব কি উট্কো ব্যবস্থা করেছ?

বলহরিবাবুর বন্ধুর পিঠে হাত রেখে এগোতে এগোতে মিহিগলায় হেসে হেসে উত্তরে বললেন,

—ওসব ছেলে ছোকরাদের মডার্ণ কাণ্ড!

শেষ শব্দ বলা হয় নি, ওই সর্বেসর্বা ঘটি ভর্তি-জল নিয়ে সেখানে

তখন উপস্থিত। ওকে দেখে বিপদ বুঝে নিয়ে গজাবাবু শ্বাস ফেলে আস্তে বললেন শুধু,

—এ শ্রীমানটি আমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছিল। আর কি।

মুখটিপে সমানে হাসছে বলহরিবাবু।

—ও! তুমি গোবর গণেশের কথা বলছ?

চামচিকেমার্কা চেহারার যে গোবর, সে প্রতিবাদ করার জন্যে গর্জে উঠল,

—মামা, এ ব্যাপারে এগিয়ো না বলছি। তাহলে আমি গেট ম্যানেজ করতে পারব না কিন্তু!

তারপরই অজা আর ভজার দিকে ভয়ংকর চোখে চেয়ে থেকে জানতে চাইল,

—জল এনেছি ভাই, ঘটির জল কার মাথায় ঢালব?

গোবর গণেশের সাহস দেখে গজাবাবু বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তবু কালো মুখে সামান্য সামান্য হাসি টেনে বলতে হল ওনাকে।

—বাবা গণেশ, এবার তুমি অনুমতি করলে আমরা ভেতরে যেতে পারি।

একথা বলেই উনি চারপাশে চিন্তিত চোখ বুলিয়ে শুধান,

—বলহরি কোথায় গেল?

আরেকটি ছোকরা পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখছিল। টিপ্পনি কাটে সে,

—উনি মড়ার সন্ধানে গেছেন।

—হোয়াট্!

নিজের কথার উত্তর পান না গজাবাবু। গোবর রাস্তা অল ক্লিয়ার দেখে বলে,

—যান রেশনকিপারের কাছে।

গজাবাবু,

—সে কি, ওখানে কেন!

—কেন বিয়ের কার্ড পড়েননি বুঝি?

কোমরের দু পাশে হাত রেখে এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে গোটা শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে বলে চলল গণেশ,

—এ বাজারে বিনে পয়সায় ভোজ খাওয়া যায়? ভারি তো একখানা তাজমহল এনেছেন উপহার দিতে!

রেশনকিপার ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্যে ব্যস্ত ছিল। সে হাকিমের মত তিন মূর্তিকে তখন রীতিমতো জিলিপির প্যাঁচে ফেলে দিল, আর কি!

—তা দরবেশবাবু এক কিলো ময়দা, চিনি তিন শ' গ্রাম আর নগদ আট আনা ছাড়ুন তো লক্ষ্মীটির মত।

গজাবাবু,

— এসব কি বলছেন আবার!

—সেকি মশাই! কার্ডের লেখা পড়েন নি?

—হ্যাঁ পড়েছি। ওটাতো প্রিন্টিং মিস্‌টেক্—

—কি বললেন, আমি প্রুফ দেখতে ভুল করেছি?

রেশনকিপারের রুদ্রমূর্তি প্রকাশ পাচ্ছে দেখে গজাবাবু কথার তাল ঠিক রাখতে বললেন,

—না মশাই আপনাকে আমরা দোষী করছি না।

এবার রেশনকিপারও দাঁত বের করে বলে

—তবে এখন নগদ ছাড়ুন বলছি, নয়ত·· গণশা—

বাবা গণেশচন্দ্র সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে দু'হাতে অজা আর ভজাকে অর্ধচন্দ্র দিতে দিতে সদর দরজা পর্যন্ত এনে বলে,

—এবার আপনারা আসতে পারেন।

গজাবাবু প্রতি নমস্কার করতেও ভুলে গেলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত উনি ফাঁকা বিয়ে বাড়ির চারিদিকে উদাস চোখে দেখছিলেন এবং পেটের ভেতর অনশনরত খিদের ঠাকুরের ছটফটানিতে বলহরিবাবু ও গোবর গণেশের শীঘ্র শ্মশান যাত্রার পারমিট ইস্যু করার জন্যে যমরাজকে মনে করলেন।

# চিড়িয়াখানা

সেবার পুজোর ছুটিতে সন্তু-নন্তু চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিল অতনু-বাবুর সাথে। অনেকদিন ধরে মনে মনে জমিয়ে রাখা এদিনটি কাছে এসে যেতে ওরা দুজনে খুব খুশী!

চারপাশে গাছগাছালিতে ভরা ছোট খোপ আর ঘরে কত মজার মজার জীবজন্তু খেলছে, হাসছে, ছুটছে। ডোরাকাটা হলুদ আর কালোয় মেশানো জামা পরা হালুম বাঘকে দেখে সন্তু একসময় বলে ওঠে,

—বাঘটা কি সুন্দর! তাই না রে নন্তু?

নন্তুও এবার ওর মনের কথা যোগ করে দেয়।

—শুধু কি সুন্দর-ই! ওই ছ্যাখ্ চোখ দুটো কেমন বড়সড় করে তাকাচ্ছে! পারলে, এখ্খুনি আমাদের সক্কলকে গিলে খাবে যেন!

অতনুবাবু বলে উঠলেন

—এই সন্তু-নন্তু তোরা খাঁচার কাছটাতে অত ঝুঁকিস না। পেছনে একটু সরে আয়।

নন্তু উত্তর দিল অমনি।

—বাপী আমরা তো দূর থেকে দেখছি।

ঠিক সে সময় সামনের মগডাল মট্ মটিয়ে ভেঙ্গে একটা হনুমান মাটিতে লাফ দিল এক্কেবারে চোখের সামনে! ওরা তখন দুজনে মুখপোড়া হনুমানের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে দিব্যি ছড়া কাটতে লাগল—

এই হনুমান কলা খাবি,
জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?

হনুমানও কম দুষ্টু নয়। সন্তুর উপরকার খোলা পকেটে বাদামের

ঠোঙা দেখতে পেয়ে এক দৌড়ে ছুটে এসে সেটিকে নিয়ে পালিয়ে গেল। এমনিতে সন্তু বেশ শান্ত-শিষ্ট ছেলে। বাদাম লুঠ করে পালিয়ে যেতে দেখে ভয় আর রাগে ও কেঁদে-ই ফেলল তখন।

অতনুবাবু,

—কেন তোরা ওর পেছনে লাগতে গেলি? অমন করিস না। ভেবেছিস ছড়ার মানে একা তোরাই বুঝিস্, ওরা বোঝে না! চল্ এবার সাদা বাঘ দেখবি।

সিংহ দেখার ব্যাপারে প্রচণ্ড ঝোঁক দুজনেরই। নন্তু বলে উঠল তাই,

—না বাপী, আগে ওই সিংহটা দেখব। একটা লোককে মেরে ফেলেছে। ওর নাম যে শয়তান।

কথা শুনে অতনুবাবু হাসলেন।

—না ওই পাজিকে দেখে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং সাদা বাঘ আর উঁচু গলার জিরাফ ঢের ভাল। ওরা ভীষণ শান্ত হয়।

নন্তু কিন্তু কম জেদী ছেলে নয়। তাই ও বায়না আদায়ের জন্যে কান্না জুড়ল।

—অ্যাঁ·· অ্যাঁ!

সন্তু নন্তুর কথায় সায় দিল। কারণ সায় না দিলে নন্তু তো ওকে মারবেল দেবে না আর কোনদিন। এমনকি ওর সাথে রাগ করে সত্যি সত্যি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কথা বলবে না। তাই ও বলল,

—চলো না বাপী আমরা শয়তানকে দেখি গিয়ে।

অগত্যা নন্তুর বায়না অতনুবাবু রাখলেন।

দেয়ালে ঘেরা উঁচু খাঁচার মধ্যে দুটি সিংহ ঘুরছিল। অতনুবাবু বলে উঠলেন,

—ওই হচ্ছে শয়তান। আর সাথে ঘুরছে ওর সঙ্গিনী সিংহী। শয়তান কিছুদিন আগে খুব ভোরে রাগে আড়ি পেতে লুকিয়েছিল। যেই না আমীর আলী নামে একজন লোক ওই খাঁচা পরিষ্কার করতে

ঢুকেছে, অমনি পাজিটা ঘাড়ে লাফিয়ে বাঁ চোখটা উপড়ে নিল। আর শক্ত দু থাবার চাটিতে আমীরের বুকের পাঁজর দিল ভেঙ্গে! অমনি যে যেখান থেকে পারল ছুটে এসে শয়তানের হাত থেকে আমীর আলীকে বের করে আনল। তাতেও কিছু হল না। হাসপাতালে যেতে-ই মারা গেল।

সন্তু-নন্তু এ ঘটনা এক মনে শুনে ব্যথা পেল বেশ। শয়তানকে মুখোমুখি দেখতে পেয়ে আবার গর্ব হচ্ছিল, তাও ঠিক। ওরা জিজ্ঞেস করল,

—ওর সঙ্গিনী তো তত পাজি নয়!

অন্নুবাবু কথায় কথায় বলে চলেন,

—তোরা জানিস না যে জলবায়ু ও পরিবেশ জীবজগতের স্বভাবের জন্যে পরোক্ষভাবে দায়ী। শয়তানের জন্ম আফ্রিকার এক ভয়ংকর বন-জঙ্গলে। জঙ্গলে যে সমস্ত পশু স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, ওরা সাধারণতঃ হিংস্র, বদ মেজাজের আর অবাধ্য হয়। কাউকে মানতে চায় না ওরা। নিজের খেয়াল খুশি মত সব কিছু করে বেড়ায়।

কথাগুলি শুনে সন্তু আর নন্তু আবার শয়তানকে দেখল একটু ভাল-ভাবে।

একসময় ওরা ফিরবার জন্যে সামনের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মন্তব্য করল ফিসফিসে গলায়,

—শয়তান শতানই বটে।

# মিঠুর কথা

মিঠু ভাবছে·····

আকাশটা না ভীষণ খেয়ালী। একটুও কথা শোনে না। সকাল থেকে শুধু গুমরে গুমরে কেঁদে চলেছে! মুখখানাও কালো থমথমে ওর। সকাল থেকে সূয্যি মামা হাসি-খুসি চেহারা নিয়ে আর দেখা দেয়নি খোলা আকাশের বুকে।

বৃষ্টি পড়ছে টিপ্ টিপ্ করে। আকাশের প্রচণ্ড চোখে কান্নার জল গড়াগড়ি খাচ্ছে সমানে। রাস্তায় হুড়হুড়িয়ে পড়া সেই জল সব জমে আছে। ফুটপাতের কোন চিহ্ন খুঁজে বার করা পর্যন্ত মুশকিল!

মিঠুর আজ স্কুলে যাওয়া হয়নি। ভোর বেলাতেই তুমুলভাবে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছিল। ওর বাবা তাই ওকে স্কুলে যেতে দেয়নি। বেশ কিছুক্ষণ পর অবশ্য বৃষ্টি ধরেছিল, তবু কিন্তু টিপির টিপির ফোঁটা পড়ার আর শেষ নেই!

বড় রাস্তার ওপরেই মিঠুদের তিনতলা বাড়ি। একেবারে কোণের ঘর থেকে ও দেখল—টুলু, পুপু, তিতি, ওরা সবাই স্কুল থেকে ফিরছে। গায়ের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে ঝুল জামার ভেজা দিক। ও হাত নেড়ে ওদেরকে ডাকল,

—এই টুলু—এই পুপু, এদিকে শোন, কথা আছে।

তিতি তখন একটা ছড়া কাটছিল ঃ

গুরু গুরু
হ'লো শুরু
ধমকায় বাজ,
সব মাটি
হাঁটি হাঁটি
বাড়ি ফিরি আজ।

ঠিক সে-সময় বড় রাস্তার মুখে এক দোকানীকে মনোযোগ দিয়ে তেলেভাজা ভাজতে দেখে বলে উঠল পুপুও :

জল জল
কোথা তল
চল চল বাড়ি
পাঁজা পাঁজা
তেলে ভাজা
ডাকে হাত নাড়ি।

এতক্ষণে টুলুরা লক্ষ্য করল মিঠু ওদেরকে ডাকছে। ও বলল,

—এই তিতি, এই পুপু ছাখ ছাখ মিঠু জানলায় দাঁড়িয়ে।

টুলু এবার মিঠুর দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগল,

—তুই কি বোকারে মিঠু! আমরা কি সুন্দর জল ঠেলতে ঠেলতে বাড়ি ফিরছি। কি মজা লাগে না রাস্তা-ভরতি জলে হাঁটতে! পা ফেললেই ছপ্ ছপ্ শব্দ হয়! আর তুই বোকা সারাটা দিন ঘরের ভেতর আঁটকে রইলি। আমরা স্কুলে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে চোর চোর খেললাম। জাম গাছ থেকে জাম ছিঁড়ে খেলাম কত! জানিস—রাণুদি, ফুলদি আজ স্কুলে আসেনি। তাই কেউ চোখ রাঙিয়ে ভয়ও দেখায়নি আমাদের।

এত সব শুনে মিঠুর মন খারাপ হতে যাচ্ছিল। ধরা গলায় বলল তবু,

—কি করব ভাই, বাবা যেতে দিল না যে। বলল, মিঠু বাড়ি বসে পড়াশুনা করো। বাইরে বেরুলে ঠাণ্ডা লাগবে। আমার তো আবার একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়! তাই আর আজ যাওয়া হল না স্কুলে।

তারপর ও কি যেন একটা ভেবে বলে উঠল,

—এই তোরা বাড়ি যা। এ জলে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাৎ ঠাণ্ডা লাগবে। জ্বর হবে যে!

মিঠুর উপদেশ শুনে টুলু পুপু তিতি জিব ভেঙাল, হাসল।

ঠিক সে সময় না ছুটো দোতলা বাস এপাশ-ওপাশ দিয়ে দৌড়ে চলে যেতে কয়েকটা বড় ঢেউ উঁচু হয়ে দুলে দুলে ছুটে চলল।……জলের এলোমেলো ঢেউ বিচ্ছিরিভাবে ভাসিয়ে রেখেছে চারদিক। আকাশের খেয়ালের ওপর মানুষের তো আর কিছু করার নেই! টুলু আর পুপু টাল সামলাতে পারল না। ওরা ধপাস্ করে পড়ে গেল জলে। ওদের বই-টই, জামা-প্যান্ট ভিজে একাকার!

তা দেখে মিঠুর কি হাসি না তখন!

# বুদ্ধিসুদ্ধি

গোটা শরীর সমানে জ্বলে যাচ্ছে রাগে। জ্বলবে না? টুকাইয়ের পোষা হাড়-পাজি মিনি বেড়াল আজও ভেজা পা ফেলে ফেলে এসে পুপুনের মাছের ঝোলে জিব ঠেকিয়ে গেছে! আর কী ওটা খাবারের টেবিলে তোলা যাবে? অসুখ-বিসুখ হবে না! কত ঘাটের নোংরা ছুঁয়ে এসেছিল কে জানে। মিনি পাজি তো ওই স্বভাবের-ই।

টুকাইয়ের কাছে নালিশ করে না ও? করে না আবার! তখন দু-এক দিন বেশ নজরেই থাকে বেড়ালটা। তা আর কদ্দিন? এ-বাড়িতে ওর আড়ি পেতে আসা-যাওয়া আছেই। হয় সব চেখে-চুখে শেষ করবে, নয় খাবার দাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যাবে।

পুপুন যখন দুপুরে স্কুলে থাকে, আর ওর মা কাজকর্ম চুকিয়ে চোখের পাতা বোজেন, ঠিক ওই সময়ে এসে থাকে বেড়ালটা। আজ কী বুঝতে পারত পুপুন? যদি না স্কুল ফেরত পথে ঝোলের হলুদ রংটা হতচ্ছাড়ার দুধ ধবধবে গায়ে লেগে থাকতে দেখত!

ঠিক করল পুপুন—মিনি পাজিকে যে ভাবে হোক ও জব্দ করবেই? কিন্তু ওকে কাছাকাছি পাবে কী করে? আর মিনির সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপে কেমন করেই বা পেরে উঠবে?···ভাবতে ভাবতে পুপুন বারান্দা পেরিয়ে একটা ছোটখাটো ঢিল কুড়িয়ে নিল। ওটা ও ছুঁড়ে মারবে মিনির গায়ে।

এদিকে মিনি কিন্তু তখনও ওর ভয়ানক দুষ্টু দুষ্টু চোখ মেলে রেখে-ছিল পুপুনের দিকে। যেই পুপুন ঢিল ছুঁড়তে যাবে, অমনি মা ফেললেন দেখে। সঙ্গে সঙ্গে মা বলে উঠলেন,

—এ কী! ঢিল ছুঁড়ছ কেন?

—ছুঁড়ব না? মামণি জানো আজও টুকাইয়ের 'নটি বেড়ালটা'

আমার মাছের ঝোলে জিব ঠেকিয়ে গেছে! ওকে আজ শাস্তি দেব, দেবই।

পুপুনের মনের রাগ রাগ ভাব লক্ষ্য করে মা বোঝালেন,

—ছিঃ পুপুন অমন করতে নেই বাবা! আমার-তোমার মত ওর কী বুদ্ধিশুদ্ধি আছে? কাল থেকে আমি বরং তোমার খাবার অন্য ঘরে তুলে রাখব।

ঢিলটা হাতের ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল কেন যেন! পুপুন নরম চাউনিতে বেড়ালকে দেখে নিয়ে মনে মনে বলল শুধু,

—সত্যি তো, ওর কী আর অত বুদ্ধিশুদ্ধি আছে? মিনিটা বোকা, মাথাটাও মোটা।

## হুতহুতুম রাজ্যি

ওই যে সামনের রাস্তা এগিয়ে চলেছে, পুপলুর চোখ ছিল সে-দিকেই। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে চোখের সামনে ভাসে গ্রামের ছবি। ত্ব'পাশে গাঢ় সবুজ মাঠের পর মাঠ। ভীষণ ফাঁকা রাস্তা। গ্রাম হলে কি হবে, মানুষের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুপলু ভাবে, এ আবার কোথায় এল ও।

এ-সব সবুজ মাঠের দেখাশুনো করে কারা? মানুষ ছাড়া এসব দেখা কারোর পক্ষে সম্ভব? ভাবতে ভাবতে পুপলু কত পথ পেছনে ফেলে এসেছে, ওর খেয়াল নেই তবু। এতক্ষণ সবুজ ছিল, চোখের কাছে ভেসে উঠল হঠাৎ হলুদরঙা মাঠ। রঙ পাল্টে গেল!

পুপলু দেখল, বাঁ পাশের হলুদ মাঠের ধারে মাথায় বেতের ছড়ানো টুপি পরা বয়স্ক চাষী এক বসে। জিরোচ্ছিল বোধহয়, উঠে গিয়ে হাতের কাস্তে নিয়ে মাঠের দিকে পা ফেলতে যাচ্ছিল, ওকে দেখে দাঁড়াল একটু।

মানুষ দেখে, মনে মনে আনন্দ হল। তাই ও জিজ্ঞেস করে,

আচ্ছা, এ জায়গার নাম কি দাদা?

শুকনো মুখ তুলে চাষী একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে। কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে আবার বলে উঠল পুপলু,

ও দাদা, এ জায়গার নাম কি বলবেন?

একথার পরও কোন উত্তর এল না চাষীর কাছ থেকে। কানের সামনে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে উঁচু গলায় বলে উঠল তাই,

ও দাদা, এটা কোন দেশ?

চাষী ভদ্রলোক হাঁটুর ওপরে পরা কাপড়ের ভাঁজ থেকে সাদা কাগজের টুকরো বার করে দেখাল, তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা,

—আজকে আর কথা বলব না, শুধু কাজ। কাল কথা হবে। রাজা বলে দিয়েছেন।

ও কি বোকা? কানে শোনো না! মুখে না বলে, কাগজ দেখিয়ে দিল। পাগলও হতে পারে, কে জানে! আর দাঁড়িয়ে না থেকে ও হাঁটা স্থুরু করল।

...উল্টো দিক থেকে কালো কুচকুচে কোট আর পা-জামা পরা বছর সতেরর ছেলে আসছে। পুপলুর চোখে তা পড়তে ভাবল, যাক আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে। ও নিশ্চয়ই কথার উত্তর দেবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে পুপলু একভাবে। ক্রমশ ছেলেটা দূর থেকে সামনা-সামনি এসে গেল। কিছু বলে নি তখনও পুপলু, শুধু ওর দিকে তাকিয়ে। ছেলেটার পিঠে দু'হাত লম্বা গোল ফ্লাস্ক বাঁধা। দুধ রয়েছে ওটায়। তা বোঝা গেল সামনের রাস্তায় চোখ ফেলতে। এগিয়ে আসতে থাকায় টিনের ফ্লাস্ক থেকে দুধের সাদা ফোঁটা টপটপ করে পড়ছিল এতক্ষণ!

ও কোন কথা বলে না মুখ খুলে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে পুপলুকে। রাগ হল প্রচণ্ড, বলল—

আচ্ছা, এ জায়গাটার নাম কি?

কোন কথা বলে না তবু। পকেটে আঙুল ঢোকাতে যাচ্ছে দেখে মনে পড়ে গেছে চাষীর কথা! ছেলেটাও সাদা কাগজ সামনে মেলে ধরল। পরিষ্কার ভাবে একই কথা লেখা তার ওপর।

আজকে আর কথা বলব না। শুধু কাজ। কাল কথা হবে। রাজা বলে দিয়েছেন

পকেটে কাগজ ঢুকিয়ে রেখে সোজা রাস্তায় যেমন হাঁটছিল, সে-ভাবেই চলতে থাকল ও।...চোখ ঘুরিয়ে কতক্ষণে ছেলেটা রাস্তা দিয়ে মিলিয়ে যায় একমনে তা দেখছিল পুপলু। নাক চ্যাপ্টা এক বাসের চেহারা চোখে পড়ে এবার। মনে আনন্দ হল, সে আর

কতক্ষণ! হাত দেখাতেও থামল না বাস। বাসের পেছনের হুতহুতুম লেখা শব্দ দুটো নিয়ে উড়ে গেল!

ধুলোর ঝড় উঠল সঙ্গে সঙ্গে। চারদিক ধুলোয় ছেয়ে গেছে। চোখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দেখে পুপলু দু'হাত মেলে চোখ আড়াল করল কিছুক্ষণ! তারপরই হাত সরিয়ে নিতে দেখে ধুলোর সুন্দর ঢেউ! সামনের রাস্তা ওই দূরে যেখানে আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, তার মাঝখানে, হ্যাঁ ঠিক ওখানে কালো লম্বামাথা একটা খাড়া হয়ে উঠছে।... পুপলু দৌড় স্বরু করল ওদিকেই। প্রাণ খুলে দৌড়চ্ছে একেবারে। কালো দিকে যাচ্ছে, যত ততই ওটা স্পষ্ট হচ্ছে! কোন গীর্জার চূড়া কি? তা ত মনে হয় না! গীর্জা হলে দু'পাশে টানা দেয়াল রয়েছে কেন? কোন রাজবাড়ি কি! এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক, কি হতে পারে। এখন ত সবে সূর্য মাথার ওপর।

কয়েক পা এগিয়ে এসে সে দেখে ছোট্ট কাঠের গায়ে কালো মোটা অক্ষরে লেখা হুতহুতুম। এ আবার কি নামরে বাবা, হুতহুতুম! এ নামে কোন দেশ আছে বলে ত পুপলুর জানা ছিল না আগে।

পুপলু এরকমই! কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে। যে দিকে দু'চোখ যায়, সোজা হাঁটা দিয়েছে। খালি পালিয়ে বেড়ানো স্বভাব। বাবা-মা পড়াশুনা নিয়ে বকাবকি করলে এরকম একা বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। সেই গত পরশু থেকে হেঁটে হেঁটে কত রাস্তা, সবুজ হলুদ মাঠ, সরাইখানা পেছনে ফেলে তবে এখানে এসেছে।

এতক্ষণে মানুষের হাঁটা চলা বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ ওপরে উঠতে স্বরু করেছে রাস্তাটা। পা টেনে টেনে উঠে যাওয়া ওই রাস্তায় পুপলুও উঠল। যত ওপরে উঠে আসছে, ততই সেই খাড়া মাথা সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে।... আরে, সামনে কি সুন্দর চৌকো চৌকো সবুজ ঘাসের বিছানা! কোণে কোণে ঝাউ গাছের ছাটা মাথা! পেটের দিক মোটা, ওপরটা রোগা লিকলিকে।...ওখানটা নীল মত কেন? জলভর্তি-ই ত। নড়ছে যেন একটু। ছোট্ট পুকুর কি?

পুকুর নয়, বাঁধানো চৌবাচ্চাই।···ওখানে যাওয়া সম্ভব? চারপাশ ঘিরে প্রকাণ্ড দেয়াল যে! তাহলে ওটা নিশ্চয়ই রাজবাড়ি।

প্রকাণ্ড চেহারার একজন বাঁ পাশের তিনতলা সোনারঙা বাড়ির ঝুল বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কি জানি, সে-ই বুঝি এ বাড়ির মালিক। না হলে নিশ্চয়ই রাজা। গলায় আবার মোটা-সোটা সোনার হার পরা অনেকগুলো।

চারপাশ নির্জন। চুপচাপ। কারুর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি, হই হট্টগোল নেই। এমন দেশ কোথাও গেলে পাওয়া যাবে না কি!···বাড়ি যখন রয়েছে, গেট থাকা উচিত। নিশ্চিন্ত মনে পুপলু দাঁড়াতে পারছে না উঁচু টিলার ওপর। দেয়ালের ওপাশে কালো মোটা দাগের ঢেউ খেলানো রেখা। ঠিক বিশাল এক কাপড় কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছে। টান না থাকায় তাই ভাঁজ ফুটে উঠেছে। তাহলে এটা পাহাড়ী কোন দেশ!

তড়বড়িয়ে নিচে নেমে পড়ল। তাড়াতাড়ি আসতে ওর পায়ের এক পাটি চটি গেল ছিঁড়ে! এই চটি পায়ে কত রাস্তা হাঁটা যায় আর! রাগ ধরল পুপলুর। দুটোকেই দিল ছুঁড়ে। যেই না চটি একটা ডান পাশের গাছের গায়ে ধাক্কা খেল, অমনি মনে হল কিছু যেন নড়ছে! মাটি নড়ে কেন? মুখ ঘুরিয়ে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটা দেখতে চাইল, ডান পাশের দেয়ালের কোণ ফাঁক হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। একটুও ঘাবড়াল না পুপলু। দৌড়ে দৌড়ে নামতে লাগল। গাছের সামনে এসে দেখে গাছটা সোজা দাঁড়িয়ে ঠিকই, তবে দু খণ্ড হয়ে গেছে।

গাছের গুঁড়ির কাছে মাটি কেউ খাবলে রেখেছে। পর পর সব সিঁড়ি পড়ে। অবাক হল পুপলু! এত সুন্দর এক রাজ্য লুকিয়ে ছিল, বাইরে থেকে কে বলবে! কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলে কেউ যদি ধরে আটকে রাখে, তাহলে সারা জীবনের জন্যে আর বাড়ি ফিরতে হবে না।··আচ্ছা, একবার নিচে নেমে দেখাই যাক ওই

সোনা রঙা তিনতলা বাড়িতে একবার যদি ঢোকা সম্ভব হয়! ··সিঁড়িতে চোখ ফেলে পরক্ষণেই দেখে, অন্ধকার মাখা রয়েছে থাক থাক সিঁড়িতে! মাটির দেয়াল ধরে পুপলু এক পা এক পা ফেলে নামতে লাগল অন্ধকারে মাঝখানে। ঘুরে ঘুরে নেমেছে সিঁড়ি।

হঠাৎ একটু আবছা আলোর রেখা উঠল ভেসে। সে-আলো জোরাল হল আস্তে আস্তে। মন থেকে তাই ভয় ভয় ভাব পালিয়ে গেল। আরো কয়েক সিঁড়ি নেমে দেখে, সামনে টানা দেয়ালে লেখা হুতহুতুম।

এ জায়গার নাম হুতহুতুম? পরের বোর্ডে লেখা ভূত-ভূতুমের রাজ্যি।···এমন রাজ্যের কথা আগে শুনেছে, মনে পড়ে না। দূর, অত ভেবে মাথা খারাপ করার কি আছে, এ দেয়ালের সীমানা কোথায় গিয়া ফুরিয়েছে, একবার দেখাই যাক না!

এদিক অন্ধকার সুড়ঙ্গের পথ শেষ হয়ে আসতে দিনের মত পরিষ্কার আলো ধাক্কা খেল চোখের পাতায়। বাঃ কি মজার কাণ্ড।···সারিসারি দোকান। সব দোকানের ভেতর ভীষণ সুন্দরভাবে সাজানো। দোকানের মাথায় এক, দুই তিন, এরকম সংখ্যা লেখা। নিচে ছোট শব্দে লেখা,

আজকে আর কথা বলব না, শুধু কাজ। কাল কথা হবে। রাজা বলে দিয়েছেন।

—তার তলায় ঢাউস অক্ষরগুলো ভূত-ভূতুমের আদেশ।

ও, এই কথা। হুত-হুতুম দেশেই থাকে ভূত-ভূতুম? রাজার খাসা নাম ত! আনন্দে পুপলু আত্মহারা! এক জুতোর দোকানের কাছে আসতে চোখে পড়ল খালি পা।

মন খারাপের কি আছে, দু'পকেটই যে ঠনঠন!···এদিকে গলা শুকিয়ে কাঠ! পেছনের দোকানে সোজা ঢুকে বলে উঠল,

আচ্ছা, এক গ্লাস জল হবে?

গোল গোখে পুপলুকে একজন কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে খচখচ করে

কাগজ লিখে দিল। এখানকার লোকেরা গলা শুকলে আইসক্রীম খায় শুধু। তুমি ব'স, কারখানা থেকে আনিয়ে দিচ্ছি।

যা বাবাঃ, এ কি কথা! জল চাইলে আইসক্রীম সাধে! কোন দেশ রে? শেষকালে পয়সা চাইলে পুপলুও সাদা দু পকেট দেখিয়ে দেবে!··· আরে, আরে দেয়ালে ওটা কি লেখা আবার?

তোমার পছন্দ মত যা ইচ্ছে নিয়ে যাও। পয়সা দেবেন ভূত-ভূতুম রাজারা।

ভূত-ভূতুম রাজারা? তাহলে ভূত-ভূতুম নামে দুজন রাজা থাকেন এ রাজ্যে?

আইসক্রীমের বন্দোবস্ততে পুপলু কিন্তু সন্তুষ্ট। বড় কাপে পেস্তা বাদাম দেয়া জমাট-বাঁধা চকলেট আইসক্রীম খেয়ে নিয়ে উঠে আসতে যাচ্ছিল, চোখে ধাক্কা দিল লেখাটা,

তোমার পছন্দ মত যা ইচ্ছে নিয়ে যাও, পয়সা দেবেন ভূত-ভূতুম রাজারা। সেটা পড়ে আগের চেয়ারে বসে হাসি মুখে জানতে চায়,

আচ্ছা আপনাদের এখানে আমার পায়ের জুতো বা স্যাণ্ডেল হবে?

কথা শেষ হবার আগেই সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন লোক চার কোণে দৌড়ে গিয়ে উড়ে এল ডজন ডজন জুতো, চটি হাতে নিয়ে। সামনে রাখলো ওগুলো। এত ভিড়ের মধ্যেও এক ঝটকায় চোখে হোঁচট খেল পেছনের সাদা নাগরাই জোড়া। দুধ-ধবধবে সাদা! ওপরে নকশা করা, লাল পুঁথি বসিয়ে ঘোড়া আঁকাও রয়েছে। বেশ খানদানি। কান চুলকাতে থাকা দোকানীকে দেখিয়ে দিল সেটা। অমনি আরেকজন বাকী সবগুলোকে ঢ্যাঙা দু'হাতে দু'দিকে ঠেলে সরিয়ে দিল। আর তারপরই পুপলুর পায়ে পরিয়ে ইশারায় হেঁটে বেড়াতে বলল এপাশ-সেপাশ। পুপলু তাই করল। ফাঁকা পকেটের কথা মনে আসতে পা থেকে নাগরাই খুলে দিতে যাচ্ছিল, দোকানীরা সব না করল আঙুল নেড়ে।

পয়সা চাওয়া দূরের কথা ; বরং ওর পিঠে সবাই মিলে চার আঙুলে তাল ঠুকে দিল একটু। মজার দোকানদার ত!

...বাইরে বেরিয়ে এক পা মাটিতে ফেলে টের পেল, ফস করে আরেক পা এগিয়ে যাচ্ছে! দারুণ মজার কাণ্ড। দৌড়ে যাবার প্রশ্নই নেই, আপনা থেকে পায়ের পাতা এগিয়ে পড়ছে।

এবার কিছু খেয়ে নিলে ভাল হত। যেই সে-কথা ভাবা, চোখে পড়ল খাবার সাজানো প্রকাণ্ড দোকান। দোকানে ঢুকে পুপলু ত অবাক, দোকানী বা খাবার দেবার লোক নেই! দু চারজন বেঞ্চিতে দিব্যি পা তুলে মেজাজে মিষ্টি বা তেলেভাজা খেতে ব্যস্ত। একবার খাওয়া শেষ হয়, আবার যেমন খুশি খাবার নিয়ে বসছে।

এ দোকানেও লেখা, তোমার পছন্দ মত যা ইচ্ছে খেয়ে যাও, পয়সা দেবেন ভূত-ভূতুম রাজারা।

পুপলুও কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকল চমচম, রাজভোগ, মালপো খাবার ব্যাপারে।

পেটে গুঁজে নিয়ে রাস্তায় পা ফেলে ফের।...ঘুরে ঘুরে এটুকু বোঝা গেল, প্রচুর ঘরবাড়ি আর গাছপালা দিয়ে হুতহুতুম দেশটা ভরা। অথচ এখানে যে যা চাইবে, হাতের মুঠোয় পেতে পারে তাই।

একি, রাস্তায় লোকের জটলা কেন? পুপলুর দিকে সবার চোখ। ওরা কি জেনে গেছে, পুপলু বাইরের দেশ থেকে হুট্ করে ঢুকে পড়েছে।

বেশ একটু দূরত্ব রেখে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। ব্যাপার সুবিধের নয়, এখান থেকে পুপলু কেটে পড়বে ভাবল। সট করে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, একটু আগে হেঁটে আসা চওড়া রাস্তা কেমন সরু হয়ে রয়েছে এখন! দোকানগুলো পর্যন্ত একটার ওপর একটা উঠে গেছে! ঠিক কাগজের ঘর-বাড়ি-রাস্তা চেপে দিলে জুড়ে আসে যেমন!

এমন কাণ্ড দেখে ভয়ে গা শিরশিরিয়ে ওঠে একটু। কিন্তু পালাবার

পথ কোথায় ? মুখ ঘুরিয়ে দেখে, সামনের রাস্তায় কথা বলতে থাকা লোকেরাও উধাও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে হাওয়া ! সবেতেই যাদুর ব্যাপার !

অজানা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল পুপলু। ছোট্ট ফুটফুটে বছর সাতেকের ছেলে একটা কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল তখুনি। হাত বাড়িয়ে হাত চেপে ধরে পুপলুর। ওকে পুপলু বলতে লাগল,

এই যে ভাই তুমি এখানে থাক ? জান, আমি কোনদিন রাজা দেখি নি। তোমাদের রাজা থাকেন কোথায় ?

ফিসফিসে গলায় তখন বলল ছেলেটা,

আমাদের রাজাকে দেখবে, ওমা কি আনন্দ ! আচ্ছা তুমি দাঁড়াও, রাজবাড়ির লোকের কাছ থেকে খবর নিয়ে এখুনি আসছি।

বলেই দৌড়ে গেল ডান পাশের কাঠের একতলা বাড়িতে। একটু পরে ও ঘুরে এসে দাঁড়াতে, জানতে চাইল পুপলু,

কি ব্যাপার, তোমার মুখ কালো হল কেন ! রাজাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেবে না ?

তবুও একটু চুপ থাকে ছেলেটা। পুপলু তাই জোর গলায় বলে, কি হল, ওরকম করছ কেন ? আমার সঙ্গে আড়ি করলে নাকি !

ও তাতেও কিছু বলে না। তারপর অবশ্য বলল ঠিকই,

খেয়াল খুশির দু রাজা আর দু রাণী থাকে হুংহুতুম রাজ্যে। রাজবাড়ির লোক বলছিল, একজন এখানে এসে সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে লুঠ করে ! কারা যেন নালিশ করেছে সে-কথা। রাজার কাছে পৌঁচেছে সে-নালিশ।

এ কথায় হাসি না পেয়ে পারে। পুপলু,

ও, এই কথা ! একজন বলতে আমাকেই বলেছে যে !

ছেলেটা ভীষণ অবাক ! এতক্ষণ পুপলুকে বাইরের লোক বলে ভাবেনি কিন্তু।

বেশ গুছিয়ে বলতে লাগল ছেলেটা এবার,

তুমি জান না ভাই, রাজার সেপাই একবার তোমাকে দেখতে পেলে ধরে নিয়ে আটকে রাখবে। তা না হলে কড়া শাস্তি পেতে হবে তোমাকে। এখানকার শাস্তি ভীষণ ভয়ংকর!

এ কথায় ঘাবড়ে যাওয়া পুপলুর পক্ষে আশ্চর্যের নয়। তাই তোষামোদ করতে লাগল ওকে,

একটা কিছু বুদ্ধি বাতলে দাও। এখান থেকে বেরিয়ে যাব কিভাবে বল না?

সোজা মাথা ওপর-নিচে দুলিয়ে ছেলেটা বলে,

তা ত বার করতেই হবে।

পুপলু,

আমার কোন দোষ নেই ভাই। বেড়াতে বেরিয়ে চটি ছিঁড়ে যেতে গাছের গায়ে জোরসে ছুঁড়ে মেরেছিলাম, অমনি মাটি ফাঁক হয়ে সুড়ঙ্গের সিঁড়ি দেখা গেল! ব্যস, সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে আসতেই ঘটল এত সব কাণ্ড।

কপালে একটু হাত বুলিয়ে এক লাফ মেরে বলে,

আইডিয়া মাথায় এসেছে। রাজাদের মন থেকে দুঃখ দূর করতে পারলে তোমাকে ছেড়েও দিতে পারে। ভীষণ খেয়াল-খুশির রাজা ত। আচ্ছা তোমার কি কি গুণ আছে?

পুপলু বলল শুধু,

ক্লাস সেভেনে পড়ি। ফুটবল, ক্রিকেট এসব খেলা খেলতে পারি ভালই। আর কিছু না।

ছেলেটা হাসি হাসি মুখে বলে,

ম্যাজিক জান তুমি?

মেঘলা মুখ পুপলুর।

না।

গান গাইতে জান?

দূর, গান-টান আমার গলায় আসে না!

তোমার কাছে চকলেট আছে ?

এবার হেসে ফেলে পুপলু,

আমি এখনও ছোট আছি, যে পকেটে সবসময় চকলেট, টফি নিয়ে ঘুরব ?

রাণীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে ?

পুপলু না জানায়। সমানে না শব্দ শুনে খুব খুশি হতে পারল না ছেলেটা। পুপলুর ওপর খুব সন্তুষ্ট নয়, তা বোঝা যায়। মনের আতঙ্ক দূর করতে জিজ্ঞেস করে ছেলেটা,

তুমি তাহলে কি জান, আরেকবার বল দেখি !

পুপপু রেগে উঠল মনে মনে।

আমার কোন গুণ নেই ! যাও।

ছেলেটার ঠোঁট ফাঁক হয়,

বড় রাজা ভূতেন্দ্র নারায়ণ সিং সেনশর্মার দশ বছরের লাল কটুকে মেয়ে আছে একটা। রাজা ওকে বিয়ে করতে বললে তখন তুমি হ্যাঁ করে দিও না কিন্তু।

পুপলু,

কেন বিয়ে করব না বলব ? রাজার মেয়েকে বিয়ে করলে ত রাজত্ব পাওয়া যায় শুনেছি।

ছেলেটা,

ওই মেয়েটা না ভীষণ অহংকারী। যা খুশি করে। রাগ হলে পেনসিলের শিস ভাঙবে ত ভাঙবেই। কাঁদতে লাগলে চৌদ্দ ঘণ্টায়ও কান্না থামে না। চব্বিশ ঘণ্টায় চব্বিশ রকম বায়না, এটা ওটা এনে দাও বলে। ভীষণ জেদী মেয়ে।

পুপলু ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কথা থামেনি তখনও ওদের, ঘোড়া ছুটিয়ে কেউ আসছে যেন !

সত্যি ত, সাদা ঘোড়া একটা টগবগ টগবগ শব্দ নিয়ে ছুটে আসছে ওদের দিকে !

ঘোড়ার পিঠে লাল জামা, ওই রঙেরই ঢোলা প্যান্ট পরা সেপাই এক বসে। কোমরে ঝুলছে কি সুন্দর খাপ খোলা ঝকঝকে তরবারি। যত এগিয়ে আসছে, পায়ের খুরের আঘাত পেয়ে ছিটকে পড়ছে ধুলোর কণা ততই।…সেপাই সামনে এসে ডান হাত নিচুতে ঝুলিয়ে দিল। আর খপ করে ওকে তুলে সাঁ শব্দে বেরিয়ে গেল!

এরপর? এরপরের ঘটনা পুপলুর মনে নেই কিছুই। এটুকু মনে আছে, ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। আর তারপর পুপলু ঘুমিয়ে পড়েছিল ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে।

বিশাল রাজপ্রাসাদ। কত সব কারুকাজ করা ভেতরটায়। মেঝেতে দুধ-ধবধবে শ্বেত পাথর পাতা। মাথার ওপর ঝাড় লণ্ঠন হাওয়ায় দুলে দোল খাচ্ছে সমানে! সিংহাসনে বসে দুই রাজা।

ধমকের সুরে একজন রাজা বলে উঠলেন,

তোমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে?

পুপলু মাথা সোজা রেখে উত্তর দিল।

কেউ না। আমি নিজে নিজেই চলে এসেছি।

এবার রাজা গেলেন ক্ষেপে। বেশ চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলেন,

তুমি জান, আমি এখানকার বড় রাজা ভূতেন্দ্র নারায়ণ?

ওঁর কথায় সামান্য ঘাড় নাড়ল পুপলু।

পাশের সিংহাসনে মেজাজে বসে থাকা আরেক রাজাও বললেন সঙ্গে সঙ্গে,

আমিও রাজা। ছোট রাজা ভূতুমেন্দ্র।

বড় রাজাকেই পুপলু সেই সকালবেলায় টিলার ওপর থেকে মেঘলা মুখে সোনা-রঙা বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির। ছোট রাজা কিন্তু বেশ হাসি খুশি চেহারার। মুখে চোখে হাসি ভাসছে সমানে।

ভূতেন্দ্র নারায়ণ,

তোমার কাছে চকলেট আছে ?

মুখ শুকনো রেখে পুপলু জানায়,

না রাজা মশাই, চকলেট খেলে দাঁত খারাপ হয়, ক্ষয়ে যায়। তাই আনি নি।

ধমকে দিলেন রাজা,

দাঁত খারাপ হবে, তাতে কি হয়েছে ? তোমাদের ওখানে ছোটরা-বড়রা সবাই ত চকলেট, চিকলেট খেতে ভালবাসে !

একজন এসে রাজাকে মিনিট পনের হু হু করে বলে গেল অনেক কথা। তারপরই বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। ব্যস্ততার মধ্যে যাবার সময় বললেন রাজা,

তুমি দাঁড়াও। একজন চোরকে শূলে চড়াবার আদেশ দিয়ে এক্ষুণি আসছি আমি।

বড় রাজ্য চলে যেতে ছোট রাজা ভূতুমেন্দ্র এবার শক্ত গলায় বললেন,

আমাদেরকে একটা ম্যাজিক দেখাও ত। হ্যাঁ—আবল তাবল করে করবে না কিন্তু। তাহলে শূলে চড়াবার আদেশ দেব।

এ-কথায় পুপলু ঘাবড়ে গেল রীতিমত। অবশ্য সাট করে মাথায় বুদ্ধি এল।

আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন ?

হাঃ হাঃ হাঃ—জল !

বলেই হাততালি দিয়ে ছোট রাজা একজন শরীর-রক্ষীকে ডাকলেন এবং বলে দিলেন চার পাঁচ কাপ আইসক্রীম আনতে।

পুপলু,

না না আইসক্রীম হলে চলবে না। জল, জল ই আনতে হবে।

রাজার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে সভার একজন বলে, বাগানে নীল পুকুরে জল আছে, আমি আনব মহারাজ ?

পুপলুকে খুব উত্তেজিত দেখাল তখুনি।

উঁহু। নীল জলে ম্যাজিক দেখানো যায় না, আপনার কালো চুল আমি সাদা করে দিচ্ছি। এই দেখুন—

ছোট রাজা,

সে কি রকম ম্যাজিক আবার !

হেসে দিল পুপলু।

আগে মাথার মুকুট খুলুন।

ব্যস্, মুকুট খুলতে যেই না বলা, রাজা গেলেন ক্ষেপে। চেঁচামেচি সুরু করে দিলেন,

তোমার ত ছোকরা দারুণ সাহস! দশলাখ টাকার হীরে বসান মাথার মুকুট আমি খুলে রাখি, আর তুমি তুলে নিয়ে কেটে পড়। না ?

কেমন হকচকিয়ে গেল পুপলু। উল্টো মানে বুঝেছেন রাজা!

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখবে একবার? লাভ হল না কিছু। চিৎকারে ফেটে পড়ছে সভা!

আজেবাজে কথার যুদ্ধ কতক্ষণ চলেছিল কেউ তা খেয়াল করেনি! বড় রাজা ভূতেন্দ্রনারায়ণ সভায় ঢুকতেই সবাই ভীষণভাবে চুপচাপ। পেছনে পেছনে ছোট সুন্দরী এক মেয়েকে ঢুকতে দেখে মুখ থমথমে হয়ে গেল পুপলুর! এই কি সেই মেয়ে? কি সাজ! চোখ ঝলসে দিয়ে যাচ্ছে! সিংহাসনে বসেই হুম করে রাজা জিজ্ঞেস করেন,

এই, তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে?

সোজা পুপলু বলে,

না, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না।

রাজার গলার স্বরে দারুণ আশ্চর্য ভাব।

কেন? কেন!

আপনার মেয়ে ভীষণ অহংকারী।

কি করে তুমি বুঝলে ?

এখানে আসার সময় ওকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি পেনসিলের শিস ভাঙতে। আর ও ভীষণ ছটফটে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না। এমন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই না।

পেনসিলের শিস ভাঙছিল বলে তুমি আমার মেয়েকে অহংকারী বলছ ? ওর অনেক আছে তাই ভেঙেছে !

অহংকারী নয়ত কি, জিনিস থাকলেই নষ্ট করতে হবে ? তাছাড়া আপনার মেয়ে সাজতে ভালবাসে। ছোটরা অত সাজে নাকি কখনও ?

রাজা।

আমার আছে তাই ওকে সাজিয়েছি।

পুপলু।

রাজামশাই, আমার বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। আপনার মেয়েকে বিয়ে করে খুশি রাখব কি করে ?

রাজা।

তাহলে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে না ?

বিনীতগলায় পুপলু বলে,

না মহারাজ।

না ?

তাহলে তোমাকে শূলে চড়ানো হবে।

আমার অপরাধ মহারাজ ?

তুমি আমার আদেশ অমান্য করছ !

শূলে চড়িয়ে আমাকে মারতে চাইছেন ? বেশ, একদিন ত সবাইকে সব কিছু ফেলে যেতে হবে। আমি না হয় আগেই সব ছেড়ে চলে যাব।

সবাইকে সবকিছু ফেলে চলে যেতে হবে ? শব্দগুলো বড় রাজার

কানে দারুণভাবে বাজতে লাগল। কথাব স্বুর বিষণ্ণ করে দিতে চাইল রাজাকে যেন। বড় রাজা তবু রেগে গেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন তখুনি,

যাও, শিগ্‌গিরি হুতহুতুম রাজ্য থেকে দশ মিনিটের মধ্যে চলে যাও। আর হ্যাঁ, তুমিই প্রথম বলে দিয়ে গেলে আমার মেয়ে অহংকারী। আচ্ছা, আমি ওকে এবার ভাল করে গড়ে তুলব।

বলেই রাজা দুটো সিন্দুক ভর্তি সোনা-জহরৎ আনিয়ে ওকে দিয়ে দিলেন।

এসব দেখে পুপলুর দুচোখ তখন রীতিমতো ছানাবড়া।

---

এ বইয়ের সব গল্প
১৯৬৪ থেকে ১৯৭৫
সালের মধ্যে লেখা।

এই লেখকের লেখা ছোটদের আরেকটি বই ঃ
টংসা চু ( শিশু-সাহিত্য সংসদ্ পুরস্কার বিজয়ী )